জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-১ (নব পর্যায়)

কুকুর, সাপ ও অন্যান্য কামড় এবং তাদের চিকিৎসা

সংকলন ও সম্পাদনা

অরণি সেন ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-১ (নব পর্যায়)

কুকুর, সাপ ও অন্যান্য কামড় এবং তাদের চিকিৎসা

সংকলন ও সম্পাদনা
অরণি সেন ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

Janaswasthya Bulletin 1 (Naba Parjay)
On Dog, Snake and Other Common Bites and their treatment
Compiled and edited by Arani Sen & Snigdha Bandopadhyay

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

গ্রন্থসত্ত্ব : সীমা রায়

প্রকাশনা : অরণি সেন
'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন'
৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

পরিবেশনা : অসিত দাস ও সুমন্ত বিশ্বাস
'উবুদশ', ৮এ নবীন পাল লেন। কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন: ৯৪৩৩৮১৯১০৩, ৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

প্রচ্ছদ ও বর্ণসংস্থাপন : রাজু রায়

মুদ্রণ : শরৎ ইম্প্রেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

যোগাযোগ : ssunnayan@gmail.com
www.ssu.2011.com

সংগ্রহ : ৬০ টাকা

উৎসর্গ

শ্রী বিজন ভট্টাচার্য

শ্রী অরুণ সেন

শ্রী ষড়ানন পান্ডা

ড: দিলীপ সোম

এবং

ড: নির্মলেন্দু নাথ

সূ চি প ত্র

আতঙ্কিত হই	অরিজিৎ সিংহ	৭
জলাতঙ্ক নিয়ে দু-চার কথা	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	১৩
কুকুরের কামড় এবং...	অশোক কুমার ঘোষ	১৭
কুকুর ও সাপ কামড়ের সমস্যা	গৌতম মৃধা	২০
অন্যান্য প্রাণীর হুল ফোটানো ও কামড় সম্পর্কে	—অরূপ আঢ্য	২৭
সাপ কামড়ের সমস্যা	দয়ালবন্ধু মজুমদার	৩৩
সাপ সমাচার	'যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা', ক্যানিং	৩৮
পশ্চিমবাংলার একটি সাপের বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র আবশ্যক কেন?	—দয়াল বন্ধু মজুমদার	৫৩
ট্যারেন্টুলা : রজ্জুতে সর্পভ্রম	শুভেন্দু বাগ	৫৮

কোন সভ্য দেশে ও সমাজে পথ কুকুর-বেড়াল ইত্যাদি রাস্তাঘাটে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো ও মলমূত্র ত্যাগ করার কথা নয়। কুকুর-বেড়ালের লালা থেকে ১০০ শতাংশ মারণঘাতী জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে। এছাড়াও কুকুর-বেড়ালের লালা, লোম, মলমূত্র, দেহে থাকা পরজীবী প্রভৃতি থেকে নানারকম অ্যালার্জি, শ্বাস কষ্টের রোগ, আন্ত্রিক রোগ, চর্ম রোগ, কৃমির রোগ প্রভৃতি হয়।

Leptospirosis, Bovine TB, Scabies, Hydatid Cyst প্রভৃতি রোগ এবং Noroviruses, Pasturella, Salmonella, Brucella, Yersinia enterocolytica, Campylobacter, Capnocytophaga, Bordetella bronchiseptica, Coxiella burnetii, Staphylococcus intermedius, Methicillin resistant staphyloccus aureus, Sarcoptic mange, Tinea corporis প্রভৃতি জীবাণুরও সংক্রমণ হতে পারে।

তাই জনস্বার্থে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ডগ পাউণ্ডে রাখার ব্যবস্থা করে পথ কুকুর-বেড়ালকে নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ থেকে নির্মুল করতে হবে। এর সঙ্গে টিকাকরণ ও গৃহসংলগ্ন এলাকায় আবদ্ধ রেখে পোষা কুকুর-বেড়ালকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গৃহপালিত কুকুর-বেড়ালদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও লাইসেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। মহানিগম, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে এবং অন্যদের সঙ্গে নিয়ে সমগ্র জনসমাজকে সচেতন করে তুলতে হবে।

জাতীয় জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর (NRCP) লক্ষ্য :

১) বিনামূল্যে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক ইমিউনোগ্লোবিন ও টিকা সরবরাহ।

২) জন্তুর কামড়ের চিকিৎসা, জলাতঙ্ক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সমন্বয়।

৩) জন্তুর কামড়ের উপর নজরদারি বৃদ্ধি এবং জলাতঙ্কে মৃত্যুর রিপোর্ট।

৪) জলাতঙ্কের প্রতিরোধ বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতাকে দূর করা।

কেন্দ্র সরকারের মৎস্য, প্রাণীজ সম্পদ ও দুগ্ধজাত বিষয়ক মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ২০৩০-র মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলকরণের লক্ষ্যে 'National Action Plan For Dog Mediated Rabies Elimination (NAPRE)' গ্রহণ করেছেন। সেই মোতাবেক কেন্দ্র সরকার 'Animal Birth Control Rules, 2023' জারি করেছেন। পথ কুকুরদের (Stray Dogs) জনসংখ্যা কমানো ও ব্যবস্থাপনা, এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্যবস্তু। দেশের প্রতিটি পৌরনিগম, পৌরসভা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও গ্রাম পঞ্চায়েত পথ কুকুরদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জলাতঙ্কের প্রতিষেধক প্রদানের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করবে। পথকুকুর নিয়ন্ত্রণ ও জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সুপ্রিম কোর্টেরও নির্দেশিকা রয়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কামড় পরবর্তী প্রতিষেধক (Post Exposure Prophylaxis) হিসাবে চামড়ার মধ্যে (Intradermal বা ID) জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টিকা (ARV) দেওয়ার পক্ষে। এটি নিরাপদ, কার্যকর, কম পরিমাণে লাগে এবং টিকা সঙ্কটের আবহে অনেকখানি টিকা ও অর্থ সাশ্রয় হয়। প্রতি ডোজে মাত্র ০.১ মি.লি. টিকা লাগে। কামড়ের পর ০, ৩, ৭ ও ২৮ তম দিনে (২-২-২-০-২) দুটি করে ডোজ শরীরের দুটি স্থানে (বাহু ও উরু) দিতে হয়। চামড়ার মধ্যে ডেনড্রাইটিক কোষ, লসিকা কলা (Lymph Tissue), টি-সেলের উপস্থিতিতে প্রতিষেধক অ্যান্টিজেন দ্রুত ছড়িয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। মাংসপেশিতে দেওয়া জলাতঙ্কের টিকা এক মি.লি. ০, ৩, ৭, ১৪ ও ২৮ তম দিনে দিতে হয়। 'হিউম্যান রেবিজ ইমিউনোগ্লোবিন' ২০ আই.ইউ. প্রতি কেজি ওজন হিসাবে কামড়ের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষত স্থান বা স্থানগুলিতে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দিতে হবে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় সাপের কামড় একটি অবহেলিত উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলের অসুখ (Neglected Tropical Disease)। প্রতি বছর বিষাক্ত সাপের কামড়ে বহু মানুষ বিনা/দেরিতে/অপর্যাপ্ত/ভুল চিকিৎসায় মারা যায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনম সেরাম (AVS), নিওস্টিগমিন, অ্যাট্রোপিন, অ্যাড্রিনালিন ইত্যাদি জীবনদায়ী ওষুধ এবং অক্সিজেন, স্যালাইন, সাকার মেশিন, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদির সংস্থান রেখে সঠিকভাবে চিকিৎসা করলে মৃত্যুকে রোধ করা যায়। সাপে কামড়ালে রোগীকে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

আতঙ্কিত হই

অরিজিৎ সিংহ

তখন আমি জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে চাকরি করি। জরুরি বিভাগে একটি বছর দশেকের মেয়েকে নিয়ে এসেছে তার বাবা ও আত্মীয়রা। ঘরের ভিতর পাখা চলছে। মেয়েটিকে নিয়ে আসা মাত্রই তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। সে ছট্ফট্ করছে, দৌড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ডাক্তারবাবু বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন কুকুরে কামড়ে ছিল কিনা? জল খাওয়ানোর চেষ্টা হল—এবারেও তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। ডাক্তারবাবু বাড়ির লোকেদের বকাঝকা করলেন—বাঁচার আশা নেই, শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হবে। ফুটফুটে সেই মেয়েটিকে দেখে কষ্ট হল। লোক জড়ো হয়ে গেছে। সবাই আহা আহা করছে। কিন্তু ওর তো কোন দোষ নেই। আতঙ্কিত হই, তাহলে দোষটা কার? দোষটা আমাদের। আমরা পারিনি সমাজকে সচেতন করতে। এটি এমন এক রোগ যা হলে মানুষকে বাঁচানো যায় না, কিন্তু আটকানো যায় সঠিক প্রতিষেধক নেওয়ার মাধ্যমে। রোগটি হল জলাতঙ্ক (Rabies)।

জলাতঙ্ক রোগী

অসুখটি বহু পুরোনো। ২৩০০ খ্রি. পূ. মিশরে এবং ১৫০০-৫০০ খ্রি. পূ. ভারতে অসুখটির হদিস মেলে। Rabies কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ rage অথবা rave থেকে (ক্রোধোন্মত্ত) যা সংস্কৃত শব্দ ‘রাভস’ এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। গ্রিক পুরাণে জলাতঙ্কের জন্য একজন দেবতার নাম উল্লেখ আছে (ARISAEUS, ARTEMIS)।

পৃথিবীর প্রায় ১৫০ টির বেশি দেশে জলাতঙ্ক হয়, আবার কিছু দেশে এই রোগ হয় না (Rabies free), যেমন—অস্ট্রেলিয়া, তাইওয়ান, সাইপ্রাস, আয়ারল্যান্ড, জাপান, নিউজিল্যান্ড, ইউনাইটেড কিংডম ইত্যাদি মূলত সমুদ্র ঘেরা দ্বীপ রাষ্ট্রে। ভারতবর্ষের লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই রোগ নেই। বিশ্বে প্রতি বছর ৫৯ হাজারের মত মানুষ জলাতঙ্ক রোগে মারা যায়, যার বেশিটাই এশিয়া ও আফ্রিকায়। পৃথিবীতে জলাতঙ্কে মৃত্যুর ৩৬ শতাংশের বেশি ভারতে, প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ মানুষ মারা যায় এবং প্রতি দুই সেকেন্ডে একজন লোক আক্রান্ত হয় কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে। বেশির ভাগের বয়স ১৫ বছরের মধ্যে।

জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুর

দায়ী জীবাণু একটি ভাইরাস—নাম লিসাভাইরাস-১ (Lyssavirus type 1) দেখতে বুলেটের মত, মধ্যে থাকে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)। এটি রোগগ্রস্ত প্রাণীর লালার মধ্যে থাকে এবং কামড় বা আঁচড়ের সময় অন্যের দেহে প্রবেশ করে। রোগের লক্ষণ প্রকাশের দু'তিন দিন আগে থেকেই জীবাণুটি লালার মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষের জলাতঙ্কের শতকরা ৯৯ ভাগ দায়ী কুকুরের কামড় বা আঁচড়। অন্যান্য উষ্ণ রক্তের (warm blooded) প্রাণীও এই রোগ মানুষকে ছড়াতে পারে, যেমন—বিড়াল, বাঁদর, হনুমান, বেজি, শেয়াল, হায়না, নেকড়ে, বুনো কুকুর (Dhole), বাদুড় (বিশেষত: লাতিন আমেরিকায়) ইত্যাদি। সাধারণভাবে কাঠবেড়ালি, ইঁদুরের কামড়ে এই রোগ হয় না। একটি জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুর তার অসুখকালে প্রায় ৪০ কি.মি. ঘুরে অনেক মানুষকে কামড়াতে পারে।

রোগটি ছড়ায় কিভাবে? কোন জলাতঙ্ক আক্রান্ত প্রাণীর কামড় বা নখের আঁচড় (কেননা এরা নখ চাটে এবং লালা থেকে জীবাণু নখে লাগে), কেটে বা ছড়ে যাওয়া চামড়া অথবা শৈষ্মিক ঝিল্লিকে (musosa) জলাতঙ্ক আক্রান্ত প্রাণীর চেটে দেওয়া হল রোগ ছড়ানোর প্রধান কারণ। এছাড়া বায়ুতে থাকা কণার (aerosol) মাধ্যমে পরীক্ষাগারে কিংবা জলাতঙ্কে আক্রান্ত বাদুড়ের বাসস্থান গুহা থেকে (যা শ্বাস নেওয়ার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে) হতে পারে। রোগাক্রান্তের অঙ্গ নিয়ে প্রতিস্থাপন (উদাহরণ, Corneal transplant) করলে হতে পারে।

মানুষের দেহে রোগটির সুপ্ত অবস্থায় থাকার সময় (Incubation Period) সাধারণভাবে তিন থেকে আট সপ্তাহ (কামড় বা আঁচড়ের দিন থেকে), কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে এই সময়টা চার দিন থেকে বহু বছর অবধি হতে পারে। এটা খুব কম সময় অবধিও হতে পারে। এটা খুব কম সময় হয় যদি গভীর বা অনেকগুলি ক্ষত হয়। মাথা, মুখ, ঘাড় বা হাতের মধ্যে হয়। অথবা জন্তুটি যদি বন্য হয়। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমে ক্ষতের চারপাশে মাংসপেশিতে ভাইরাসটি বংশ বৃদ্ধি করে এবং নিকটবর্তী স্নায়ু (nerve) অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেখান থেকে নার্ভ ধরে (প্রতিদিনে ২৫০ মি. মি) উপরে উঠে আসে মস্তিষ্কের (Central Nervous System) মধ্যে। পরে সেখান থেকে স্নায়ুর মাধ্যমে লালাগ্রন্থি ও অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে যায়। লালাগ্রন্থিতে থাকা ভাইরাস অন্যকে ছড়ায় কামড়, আঁচড় বা চেটে দেওয়ার মাধ্যমে।

মানুষ রোগাক্রান্ত হলে প্রথম তিন চার দিন জ্বর, গা-হাত-পা-মাথা ব্যথা হয়। যেখানে কামড়ে দিল সেখানে ব্যথা বা ঝিন্‌ঝিন্ অনুভব করে। পরে জল খেতে গেলে বা হাওয়া লাগলে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া অবস্থা বা খিঁচুনির মত হয় (Hydrophobia, Aerophobia)। জলাতঙ্ক রুগীরা দু রকমের হয়--- এন্‌সেফেলাইটিক (ক্রুদ্ধ ৮০ শতাংশ) এবং প্যারালাইটিক (শান্ত ২০ শতাংশ)। প্রথমক্ষেত্রে স্নায়ু উত্তেজনা, খিচুনি, ভুল বকা, লালা পড়া, হাইড্রোফোবিয়া, অ্যারোফোবিয়া ইত্যাদি দেখা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিথিল মাংসপেশি, হাত ও পা অবশ হয়ে যায়। তিন থেকে ছয় দিনের মধ্যে রুগী মারা যায়। এখন পর্যন্ত মাত্র সাত জন রুগীকে বাঁচানো গেছে। রোগটি হলে সাময়িক উপশম দেওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া কোন চিকিৎসা নেই। তাই রোগটি আটকানোই আমাদের প্রধান কাজ।

জলাতঙ্কের প্রতিরোধের বিষয়টি তিনভাবে দেখা যেতে পারে— **(১) আক্রান্ত হবার পরের ব্যবস্থা (Post-exposure prophylaxis), (২) যারা ঝুঁকির মধ্যে আছেন (Pre-exposure prophylaxis), (৩) যারা আগে টিকা নিয়েছে কিন্তু আবার আক্রান্ত (Re-exposure prophylaxis)**। কুকুর বা ঐ জাতীয় প্রাণীর

কামড় বা আঁচড় হলে, স্থানটির যত্ন নিতে হবে। ক্ষত স্থানে ভাইরাস প্রশমিত করার জন্য **Immunoglobulin** নিতে হবে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য টিকা (**Vaccine**) নিতে হবে। সম্ভব হলে প্রাণীটিকে ১০ দিন লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্ষতস্থানের যত্ন নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর উদ্দেশ্য হল ক্ষতস্থান থেকে যত সম্ভব ভাইরাসের সংখ্যা কমানো এবং এটা যত তাড়াতাড়ি হবে তত ভাল। প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে ভালভাবে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করলে শতকরা ৮০ ভাগ অসুখের সম্ভাবনা কমানো যায়। কী করে করব? ক্ষতস্থানটি ভাল করে জলের ঝাপটা বা প্রবাহমান জল ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে, অন্তত ১৫ মিনিট ধরে। তারপর স্পিরিট ও পোভিডন আয়োডিন লাগাতে হবে। সেলাই না করা উচিত, কেননা বাড়তি ক্ষত ভাইরাসের স্নায়ুর দিকে অগ্রগতিতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে চাপ সহ ব্যান্ডেজ করাই ভাল। বিশেষ ক্ষেত্রে সেলাই প্রয়োজন হলে ক্ষতস্থানের চারপাশে Immunoglobulin অবশ্যই দিতে হবে। এছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ও টিটেনাসের টিকা প্রয়োজন মত নিতে হবে। পরের বিষয় টিকা (Vaccine) এবং Immunoglobulin নেওয়া।

১৮৮৩ সালে লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের টিকা আবিষ্কার করেন (Nerve tissue vaccine)। বিভিন্ন ধরনের টিকার মধ্যে Cell culture vaccine এখন ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে Human diploid cell vaccine, Purified chick embryo cell vaccine এবং Purified verocell vaccine এর ব্যবহার বেশি। মাংস পেশির (intramuscular) মধ্যে দেওয়ার বিধি হচ্ছে—D_0 (প্রথমদিন), D_3, $D_{7,}$ D_{14}, D_{28}, যেখানে Day 1 প্রথম ইঞ্জেকশনর পরের দিন থেকে হিসেব হয় (দেওয়া হয় বাহুর deltold মাংসপেশিতে)। চামড়ার মধ্যে (intradermal) দেওয়ার বিধি হচ্ছে—D_0, D_3, $D_{7,}$ D_{28} (2-2-2-0-2), প্রথমের তিনটি দু'হাতে এবং পরের একদিন এক হাতে দেওয়া হয়। Intradermal dose এর ক্ষেত্রে প্রতি ডোজ Intramusular dose এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ। টিকা দিলে গা হাত পা ব্যথা বা অল্প জ্বর আসা ছাড়া অন্য কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না এবং সব বয়সের ক্ষেত্রেই ডোজ একই। Vaccine এর সাথে Immunoglobulin দেওয়া হয়। এটি দেওয়ার আগে চামড়ায় পরীক্ষা করে (skin test) দেখা হয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। দেওয়া হয় ক্ষতস্থানের চারিদিকে। Vaccine শুরু হবার সাতদিনের মধ্যেও দেওয়া যেতে পারে। Rabies Immunoglobulin দু'রকমের—ঘোড়া থেকে তৈরি (Equine Rabies Immunoglobulin), যার ডোজ চল্লিশ ইউনিট প্রতি কেজি ওজনে এবং মানুষের (Human Rabies Immunoglobulin), যার ডোজ কুড়ি

ইউনিট প্রতি কেজিতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেবার পর অ্যালার্জি জনিত পার্শ্বক্রিয়া দেখা যায়, তাই Human Immunoglobulin বেশি নিরাপদ। Vaccine এবং Equine Immunoglobulin সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, বাজার থেকে কিনতে গেলে আনুমানিক খরচ টিকার ক্ষেত্রে (প্রতি ডোজ) ৩০০-৫০০ টাকা, Equine Immunologbulin ১৫০০-২০০০ টাকা এবং Human Immunoglobulin ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা, প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে **কাদের টিকা দেব, কাদের টিকা এবং Immunoglobulin দেব?** Post exposure prophylaxis কে শ্রেণীবদ্ধ (Categorize) করা হয়েছে তিন ভাগে। **Catagory-I** সন্দেহজনক প্রাণীকে ছোঁয়া, খাওয়ানো, বা তার লালা লেগে যাওয়া স্বাভাবিক চামড়ার উপর—সেক্ষেত্রে সাধারণত কিছু করার প্রয়োজন নেই। **Catagory-2** সামান্য ছেঁড়া বা দাগ চামড়ার উপর কিন্তু রক্তক্ষরণ হয়নি—টিকা শুরু করতে হবে। যদি প্রাণীটি সুস্থভাবে ১০ দিন বেঁচে থাকে কিংবা পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয় প্রাণীটির জলাতঙ্ক হয়নি তাহলে পুরো কোর্স নাও নিতে পারেন। **Catagory-3** এক বা একাধিক কামড় বা ক্ষত যা চামড়া ভেদ করেছে, রক্ত বের হয়েছে অথবা ক্ষতযুক্ত চামড়ায় বা অঙ্গের উপর লালা লেগেছে অথবা বাদুরের দ্বারা আক্রান্ত—এক্ষেত্রে টিকার সাথে Immunoglobulin দিতে হবে। যদি প্রাণীটি ১০ দিন সুস্থভাবে বেঁচে থাকে বা পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয় প্রাণীটির জলাতঙ্ক হয়নি তখন পুরো কোর্স নাও নিতে পারে।

যে সমস্ত মানুষ পরীক্ষাগারে Rabies virus নিয়ে কাজ করেন, জঙ্গলে কাজ করেন, জলাতঙ্ক প্রাদুর্ভাবযুক্ত (Rabies endemic) দেশে বেড়াতে যান কিংবা যারা পশু চিকিৎসক—তাদের আগাম টিকাকরণের (Pre-exposure prophylaxis) ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে Cell Culture Vaccine দেওয়া হয় D_0, D_7, D_{21}, অথবা

D_{28} এ, মাংসপেশি অথবা চামড়ার মধ্যে। Booster dose প্রতি দু'বছর অন্তর নিতে হয়।

কেউ যদি পুরো কোর্স নিয়ে থাকেন এবং পরে যদি তার কামড় বা আঁচড় লাগে (Re-exposure Prophylaxis) তাহলে সাধারণত দুটি টিকা নিলেই হয় (D_0, D_3)। যদি অনেক বা গভীর ক্ষত থাকে তাহলে তৃতীয় ডোজও (D_7) দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে Immunoglobulin এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি পূর্ববর্তী টিকাকরণ অসম্পূর্ণ বা সন্দেহজনক হয়, সেক্ষেত্রে নতুন বা fresh case হিসেবে চিকিৎসা করতে হবে। জলাতঙ্কের প্রতিষেধক নেওয়ার ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থা, স্তন্যদান, HIV ইনফেক্শন কোন বাধা নয়। আমাদের দেশে কুকুরের কামড় আঁচড়ই বেশী। এছাড়া

বিড়াল, বাঁদর, হনুমান, শেয়াল, বেজিও আছে। আর এক সমস্যা জলাতঙ্কে আক্রান্ত গরুর দুধ খাওয়া—ফোটানো দুধ চিন্তার কারণ নয়। গরু ছাড়াও ছাগল, ভেড়া, মোষ, গাধা, শুয়োর, ঘোড়া, উট প্রভৃতি যে কোন উষ্ণ রক্তের প্রাণীর জলাতঙ্ক হতে পারে।

জলাতঙ্ক হওয়া কুকুরের লক্ষণ কী? অসুখটি হলে এদের চরিত্রের পরিবর্তন হয়—রেগে যায়, মানুষকে ভয় পায়, কামড়াতে আসে এমনকি লাঠি, মাটিতে কামড় দেয়; উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করে, গলার স্বর বসে যায়, লাল পড়ে, খেতে চায় না এবং ধীরে ধীরে অবশ ও অজ্ঞান হয়ে মারা যায়। মৃত প্রাণীটির মস্তিষ্ক, কর্ণিয়া ইত্যাদি পরীক্ষা করলে Rabies virus এর নমুনা পাওয়া যায়। গৃহপালিত প্রাণীদের টিকা দেওয়া হয় জন্মের তিন চার মাসের মধ্যে (প্রথম ডোজ)। Live virus vaccine প্রতি তিন বছর অন্তর দেওয়া হয়।

জলাতঙ্ক রোগ আটকানোর জন্য সরকারি প্রচেষ্টা আছে, Association of Prevention and Control of Rabies in India (APCRI) কাজ করে চলেছে। প্রতি বছর **২৮শে সেপ্টেম্বর দিনটি জলাতঙ্ক দিবস** (World Rabies Day) পালিত হয় লুই পাস্তুরের মৃত্যু দিনে। মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ সরকারি ও বেসরকারি স্তরে নিতে হবে আরও বেশি করে। বিদ্যালয় স্তরে এ বিষয়ে পাঠ্য বিষয় করা উচিত। যারা কুকুর বিড়াল পোষেন তাদেরকেও সচেতন হতে হবে। নিয়মিত উপযুক্ত টিকাকরণের ও নথিভুক্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। রাস্তায় বেওয়ারিশ বেড়াল-কুকুরদের Mass vaccination ও sterilization করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের Dog Pound এ স্থানান্তরিত করে নজরদারি রাখতে হবে। Public Place কে বেওয়ারিশ কুকুর-বেড়াল শূন্য রাখতে হবে। সামাজিক পশ্চাদপদতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। গরীব মানুষকে সরকারি সহায়তার কথা জানাতে হবে। সংকল্প নেবো আর যেন জলাতঙ্কে মৃত্যু না হয়। সঠিক প্রতিরোধের সুযোগ যেন সকলে সময়মত পায়।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০১৩)

মানুষের কামড় (Human Bite) : ক্ষতর গুরুত্ব অনুযায়ী চিকিৎসা। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ওষুধ লাগানো ও ড্রেসিং, টিটেনাস টক্সয়েড ইত্যাদি। কামড় দেওয়া ব্যক্তির কোন সংক্রামক রোগ থাকলে তার প্রতিকার।

জলাতঙ্ক নিয়ে দু-চার কথা

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

দ্রুত স্মরণ করে নেবার মতো কয়েকটি তথ্য দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক। অবহেলিত রোগের (প্রাণী ঘটিত) তালিকায় আছে জলাতঙ্ক বা Rabies। ২০০৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) পৃথিবীর একটি মানচিত্র তৈরি করে। এতে জলাতঙ্ক অধ্যুষিত দেশগুলোর ছবি দেওয়া হয়। আমরা সেটা এখানে রাখছি।

এ ছবি থেকে স্পষ্ট হয় এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকা কিরকম মারাত্মকভাবে জলাতঙ্কের কবলে রয়েছে। আরো বিপজ্জনক তথ্য হলো গোটা পৃথিবীতে এ রোগের মৃত্যুর সংখ্যা বছরে ৫০,০০০-৫৫,০০০। এর মধ্যে ভারতে মারা যায় বছরে ২৫,০০০-৩০,০০০। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশ মৃত্যু ভারতবর্ষে। একটি অভাবনীয় পরিসংখ্যান।

[তথ্যসূত্র: *William H. Womer and Deborah J. Briggs, "Rabies in the 21 st Century", PloS. Neglected Tropical Diseases, 2010, 4(3). e591*]

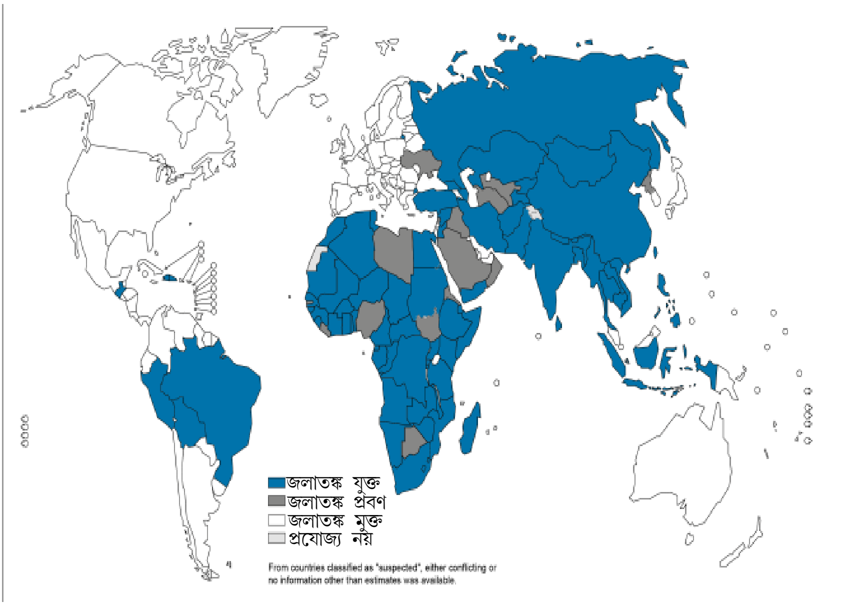

জলাতঙ্কপ্রবণ ও জলাতঙ্কমুক্ত দেশগুলি

এটা ২০১০ সালের তথ্য। ২০১২ সালের সর্বজনমান্য CDC (Centre for Disease Control) Yellow Book-এর পরিসংখ্যান বলছে সংখ্যাটা আরো বেশি-প্রতিবছরে ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। এদের বেশিরভাগ-ই হলো শিশু যারা আক্রান্ত কুকুরের সংস্পর্শে আসে।

২০১২-র Journal of Global Health [June, 2(1)] জানাচ্ছে ভারতে বছরে প্রায় দুকোটি মানুষ কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হয়। এ জার্নালে মন্তব্য—Across Asia the annual expenditure due to rabies is estimated to be reached on 563 mLb published prior to 2000...As rabies is an acute condition and its control is centered on preventive measures, incidence is the most appropriate measure of its burden in the context of improving health policy.

নিতান্ত সাধারণভাবে যা সহজে বোঝা যায় তা হলো—(১) জলাতঙ্ক যতই কালান্তক ব্যাধি হোক না কেন এটি প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগ, (২) এ রোগের প্রতিষেধক (Preventive) টিকা আছে, এবং (৩) সামান্য কিছু সতর্কতা রক্ষা করলে ‘‘জলাতঙ্ক দূর হঠো’’ বলা যায়।

PLoS Neglected Tropical Diseases–এর উল্লেখিত প্রবন্ধে নির্দিষ্ট ভাবে বলেছে—recent advances in coordinated surveillance practices, referred to as ‘‘enhanced rabies surveillance’’ and involving search and control measures, have greatly facilitated detection of animal rabies cases in a number of border areas shared by Canada, Mexico, and the United States, and have led to definitive actions for controlling rabies in strategically key areas.

এটুকু কাজ-ও আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের, সমাজে স্থিত আমাদের মতো ‘‘অগ্রণী’’ মানুষদের এবং আরো অনেক সংগঠনের তরফে শক্ত হাতে ধরা হয় না কেন এ এক রহস্যময় ব্যাপার। কৃমি, জলাতঙ্ক এরকম মোট ১৭টি রোগ WHO চিহ্নিত করেছে Neglected Tropical Diseases (NTD) হিসেবে। আর PLoS Neglected Tropical Diseases-এর উল্লেখ তো আমরা একাধিকবার দেখলাম।

লন্ডনের বিখ্যাত Guardian পত্রিকায়, অ্যানা স্কট প্রবন্ধ লিখেছেন—15 thoughts on eliminating neglected tropical diseases. আন্তর্জাতিক স্তরে *PLoS, Lancet* এমন কি New England Journal–এর মতো পত্রিকায় এসব নিয়ে অনেক লেখালেখি, মতামত তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে আজ এ রোগগুলো নিয়ে তবুও আর্ন্তজাতিকস্তরে কথা-বার্তা বলা যাচ্ছে।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝবো, কেউ একজন কৃমিতে মারা গিয়েছে এটির রোগ হিসেবে যা ওজন আছে তার চেয়ে অনেক বেশি ওজনদার হলো হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর। রোগের মাঝেও শ্রেণী বিভাজন আছে। রবার্ট অ্যারোনোভিৎস্ তাঁর *Making Sense of Illness: Science Society, and Disease* (Cambridge University Press, 1998) গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন—Description of progress is not only debatable on its own merits but is also a tautology-molecular research leads to more molecular insights than nonmolecular research.

কানাডা থেকে প্রকাশিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের পত্রিকা CMAJ-তে (‘‘Rabies in India’’, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০০৮) বলা হয়েছে, ভারতে জলাতঙ্ক প্রতিহত না করতে পারার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এটাকে ‘‘notifiable disease’’ হিসেবে গণ্য না করা—যেমনটি গুটি বসন্তের ক্ষেত্রে হয়েছিলো। যদি এটা করা হতো তাহলে কোন একটি অঞ্চলের মানুষ বুঝে নিতে পারতেন কেন কোন অঞ্চলে জলাতঙ্ক হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারতো। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—বিগত ২০ বছরে (২০০৫ সালের হিসেবে) ইংল্যান্ডে ১২ জন জলাতঙ্ক রোগীর হদিশ মিলেছে। ১২ জনের ১১ জনই বিদেশে রোগাক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে দেশে এসে। Notifiable disease হবার এ হলো একটি বিশেষ সুবিধে। ২০১১-এর সেন্সাস অনুযায়ী, ভারতে মোটামুটি হিসেবে প্রায় ৩ কোটি কুকুর আছে। কুকুর আর মানুষের অনুপাত হলো ১/৩৬। না-পোষা, পথের কুকুরের শতকরা হিসেবে হলো মোট কুকুরের ৮০ শতাংশ। এরকম একটি প্রেক্ষাপট থেকে *PLoS Neglected Tropical Dieases*-এর আরেকটি সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছে—Rabies remains an avoidable cause of death in India. As verbal autopsy is not likely to identify atypical or paralytic forms of rabies... The concentrated geographic distribution of rabies in India suggests that a significant reduction in the number of deaths or potentially even elimination of rabies deaths is possible. (October 4, 2012)

এতসব কথার পরে প্রশ্ন উঠবে এগুলো তো সমস্যার নানা দিক। সমাধান কোন পথে? আরো কিছু আলোচনায় যাবার আগে জলাতঙ্ক সন্দেহ হলে কি করা উচিত সেটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। দু-ধরনের টিকা পাওয়া যায়—Human diploid cell vaccine (HDCV) এবং Purified chick embryo cell vaccine (PCECV)। টিকা নেবার সময়ে যে কোন একধরনের টিকা নেওয়া বাঞ্ছনীয়। মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম ধরনের টিকার দাম বেশি।

যদি রোগীর বিভিন্ন জয়গায় গভীর এবং গুরুতর ক্ষত হয় তাহলে post-exposure vaccination করতে হবে। আরেকটি হয় pre-exposure vaccination। যারা কুকুরের পরিচর্যা করে, ল্যাবরেটরি কর্মী বা পশু-চিকিৎসক এ ধরনের মানুষদের জন্য pre-exposure vaccination প্রয়োজন হয়। আর অনেক টিকার মতো এক্ষেত্রেও প্রথম টিকা যে কোন সময়ে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম টিকার ৭ দিন পরে ২য় টিকা, ১৮-২১ দিন পরে তৃতীয় টিকা নিতে হবে। Booster হিসেবে এর পরে প্রতি দু'বছরে একবার করে টিকা নিলে আর জলাতঙ্ক হবার সম্ভাবনা থাকে না।

Post-exposure vaccination নিতে হবে যাদের সংক্রমিত কুকুর কামড়েছে বা এরকম কামড় ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এর আবার দুটি ধাপ আছে। রোগীর বিভিন্ন জায়গায় গভীর এবং গুরুতর ক্ষত হলে প্রথমে সেই ক্ষতস্থানগুলি HRIG (human rabies immunoglobulin) দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে, একই সাথে প্রথম টিকা দেওয়া হবে। প্রথম টিকার ৩ দিন পরে ২য় টিকা, ৭ দিন পরে তৃতীয় টিকা, ১৪ দিন পরে চতুর্থ টিকা এবং ২৮ দিন পরে পঞ্চম টিকা দিতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে, কুকুর কামড়ালে সবার আগে ক্ষতস্থান ২০ মিনিটের মতো সাবান জল দিয়ে ক্রমাগত ধুয়ে যেতে হবে।

সাপের কামড় নিয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কাজ হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ডাঃ অমিয় হাটি, 'ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থা' প্রমুখেরা। জলাতঙ্ক নিয়ে 'Mission Rabies' বলে একটি সর্বভারতীয় উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে। এদের ব্লগে লেখা হয়েছে—প্রতি ২ সেকেন্ডে ভারতে একজন মানুষ কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হয়। ১ দিনে ২৪ জন মানুষ মারা যায় এই কালান্তক ব্যধিতে—এর অর্ধেক হলো শিশু। Post-exposure vaccination এর জন্য বছরে ভারতের খরচ হয় প্রায় ১,৩৫০ কোটি টাকা। এদের প্রত্যয়—In September 2013, we aim to vaccinate 56,000 dogs in 30 days. And that's just the beginning.

২০১৩-র সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখ World Rabies Day। আমাদের আজ উদ্যোগ নেবার সময় এসেছে অন্য সমস্ত উদ্যোগের সাথে সামিল হয়ে সম্পূর্ণ প্রতিহত করা সম্ভব এমন একটি রোগকে রোখার জন্য। এর জন্য পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি করার যেমন প্রয়োজন আছে, ততোধিক প্রয়োজন চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, অ-সরকারি সংগঠন এবং সর্বোপরি, সরকারের তরফে সদর্থক উদ্যোগ গ্রহণ করা। নইলে সবকিছুই কাগজে কলমে এবং কথার কথা হয়ে থাকবে।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০১৩)

কুকুরের কামড় এবং...

অশোক কুমার ঘোষ

সরকারি ডাক্তার হিসাবে বেশ কিছু জেলার হাসপাতালে ঘুরেছি। কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত মানুষদের সব জায়গাতেই পেয়েছি। তাঁদের কেউ কেউ অত্যধিক চিন্তিত, আবার কেউ কেউ নিস্পৃহ। আসলে জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা যথাযথ ভাবে উপলব্ধ নয়।

প্রথমবার দেখার ভিত্তিতে, অভিজ্ঞতা বিচিত্র। মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকার সময় দেখেছি কুকরের কামড়ে আক্রান্তরা এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশেষ আসতেন না দুটি কারণের জন্য। এক, কুকুর কামড়ের প্রতিষেধক টিকা (Anti Rabies Vaccine) ওইখানে পাওয়া যেত না, এবং দুই, স্থানীয় এক মোড়ল কুকুরের কামড়ের জন্য জড়িবুটি দিতেন। তাঁর দাবি, এই 'বংশপরম্পরায় অর্জিত' দ্রব্যগুণে তখনও পর্যন্ত কারুর জলাতঙ্ক রোগ হয়নি। সত্যাসত্য জানি না, তবে সেই জড়িবুটির নাম জানতে পারিনি পারিবারিক জ্ঞান রক্ষিত রাখার তাগিদে।

তবে মুর্শিদাবাদে থাকার সময় অন্য এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এক 'পাগলা কুকুরে'র হঠাৎ আবির্ভাব অন্য এলাকা থেকে। সাধারণত এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে, স্থানীয় কুকুররা সমবেতভাবে আক্রমণ করে। এ ক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা, অন্য কুকুরেরা ছিটকে দৌড়ে পালাল। কামড় খেল একটা বাচ্চা কুকুর, যে কিছুদিন বাদে মারা গেল সম্ভবত জলাতঙ্ক রোগে। ধারণা হল কুকুররা বুঝতে পারে কোন কুকুর জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত।

পথ কুকুর

পরবর্তী অধ্যায় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এক স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। এখানে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক দেওয়া হত। কুকুরের কামড় ছাড়াও বিড়ালের আঁচড় এবং হনুমানের কামড়ের জন্য বেশ কিছু রোগী আসতেন। খেয়াল করেছি, সাবান জলে ক্ষতস্থান ধোওয়ার কথা বিশেষ কেউ জানতেন না, বরং অনেকে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে ক্ষতস্থান পরিস্কার করতেন, যা ক্ষতিকর।

এই স্থানে থাকাকালে এক ১২ বছরের ছেলেকে দেখি, যার মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল এক দিন ধরে। পরীক্ষার মাধ্যমে অন্য কিছু না পাওয়ায় এবং ইতিহাস জেনে সন্দেহ হওয়ায় তাকে ID Hospital এ পাঠান হয়। জানা যায় সে জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত ছিল। এই জাতীয় রোগী পরবর্তী কালেও দেখেছি যার অসুবিধা ছিল। হাওয়া লাগলেই শ্বাসকষ্ট হত। প্রসঙ্গত সেই সময় গরমকাল ছিল।

আর একটি ঘটনায় সাক্ষী এই স্থান। দুজন স্কুল পড়ুয়াকে কুকুর কামড়ায়। একজন হাসপাতালে আসে চিকিৎসার জন্য অন্য জন অগ্রাহ্য করে। দ্বিতীয়জন জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত হয়ে মারা যায়।

পরবর্তী অভিজ্ঞতা বাঁকুড়া জেলার এক মহকুমা হাসপাতালে। এখানেও জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা (ARV) পাওয়া যেত বেশির ভাগ সময়। কিন্তু অন্য জায়গার মত ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Anti Rabies Serum) পাওয়া যেত না। অভিজ্ঞতা অন্য স্থানের মতই তবে এখানে কয়েকজন আসতেন জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত গরুর দুধ খাবার জন্য।

কলকাতার এক হাসপাতালে অভিজ্ঞতা আগের থেকে অন্য রকম খুব বেশি নয়। এখানে স্থানীয় ব্যক্তি ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে রোগী আসেন রেফারড হয়ে। আশ্চর্য লেগেছে, রেফারের কারণে ২০ কিমি দূর থেকে রাত ২ টোর সময় হাজির হয়েছেন, এতটা ভয় না দেখালেও চলত এবং রেফার করতেও হত না যদি সেই স্থানীয় ডাক্তারবাবু রোগীকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে বলতেন।

জলাতঙ্কের প্রতিষেধকটি Intradermal দেওয়ার কারণে লাগছেও কম। ইমিউনো গ্লোবিন জরুরি বিভাগে থাকলে ভাল হত কারণ বিশেষ ক্ষেত্রে এটি যত তাড়াতাড়ি ব্যবহার করা যায় তত বেশি উপকারী।

তিরিশ বছর অভিজ্ঞতার কারণে মনে হয়েছে এখনও জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্যক এবং সঠিক ধারণা নেই। প্রচারের মাধ্যমে সেটা করা উচিত এবং রোগীদের বোঝাতে হবে সত্বর সাবান জলে ক্ষতস্থান পরিষ্কারের গুরুত্ব।

আর একটা ব্যাপার আছে, সব অসুখ পরিপূর্ণ লক্ষণ (classical symptoms) নিয়ে সব সময় উপস্থিত হয় না। কিছু কিছু জীবন সংকটপূর্ণ অসুখ আছে যা নির্ণয়

করতে দেরি হলে জীবন সংশয় হয়। এগুলির কথা বিশেষ ভাবে মাথায় থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম, যেমন Acute Myocardial Infarction (অনেক সময় রোগী আসেন শুধু বমি নিয়ে), Ectopic Pregnancy (পেট ব্যথা, রক্তস্রাব, ভুল হতে পারে Dysmenorrhoea during menstruation এর সাথে), কালাচ সাপের কামড় (অনেক সময় সাপও দেখা যায় না, কামড়ও বোঝে না রোগী) এবং অবশ্যই জলাতঙ্ক রোগ যার কথা দুটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

খেয়াল রাখা প্রয়োজন, জলাতঙ্ক এমন একটি রোগ যার কোন চিকিৎসা নেই। তাই কুকুর কামড়ালে Anti Rabies Vaccine (ARV) আর Rabies Immunoglabulin দিতে হবে কামড়ের ক্যাটেগরি অনুযায়ী। সাধারণ ভাবে ARV (প্রতিষেধক) এবং ইমিউনোগ্লোবিন নিয়মিত পাওয়া যায় বহির্বিভাগে, তাতে অসুবিধা নেই। তবে ইমিউনোগ্লোবিন যদি জরুরি বিভাগে পাওয়া যায় তাহলে নির্দিষ্ট জীবাণু প্রথম অবস্থাতেই নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০১৩)

কয়েকটি জলাতঙ্ক রোগ মুক্ত দেশ

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, ইউনাইটেড কিংডম, জাপান, সিঙ্গাপুর, ফিজি, যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই

কয়েকটি জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রিত দেশ

বেলজিয়াম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, হংকং, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আমিরশাহী, তাইওয়ান

কুকুরের কামড়ের কারণে জলাতঙ্ক রোগে মানুষের মৃত্যু ২০৩০-র মধ্যে রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে গ্লোবাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান তৈরি হয়েছে যার উদ্দেশ্য:

১) সমূহ পদ্ধতিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে কুকুর থেকে মানুষে জলাতঙ্কের সংক্রমণ এবং তদ্‌জনিত মৃত্যু রোধ।

২) প্রমাণ নির্ভর চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন।

৩) কর্মসূচিগুলি কার্যকর করতে স্থানীয় স্তরে বিবিধ অংশীদারি সংস্থাকে যুক্ত করা।

কুকুর ও সাপ কামড়ের সমস্যা

গৌতম মৃধা

আমাদের দেশ মূলত উষ্ণ বা গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অথবা ক্রান্তীয় (Tropical) জলবায়ুর দেশ। অনুকূল পরিবেশ, উর্বর সমতল, মিষ্টি জলের সংস্থান, প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য জনসংখ্যা যেমন প্রচুর, পাশাপাশি পশুপাখি সহ অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যাও প্রচুর। অরণ্য ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় এবং মানুষ ক্রমশ অরণ্য দখল করে নেওয়ায় বন্য জন্তুরা একদিকে বিপন্ন অপরদিকে মানুষের মুখোমুখি। তাই প্রায়ই হাতির আক্রমণ, বাঘ—চিতাবাঘ-ভালুক-কুমিরের কামড় আঁচড়ের খবর পাওয়া যায়। সর্প দংশনের

কুকুরের কামড়

গোখরো সাপ, বিষধর

সংখ্যা বাড়ে। এছাড়া ভারত ধর্মেরও দেশ। অনেকেই গরু, হনুমান প্রভৃতিকে মাতা বা দেবতা, সাপকে মা মনসার বাহন মনে করেন। এখানকার অধিবাসীরা জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে অভ্যস্ত। গৃহে রাস্তাঘাটে প্রচুর কুকুর, বেড়াল, গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর, হনুমান ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এই কারণে কুকুরের কামড় এবং সাপের কামড় আমাদের দেশের দুটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

কুকুরের কামড়ের সমস্যা

প্রতি বছর ভারতে অন্তত ২০,০০০ মানুষ জলাতঙ্ক (Hydrophobia) রোগে মারা যান। সংক্রমিত কুকুর ছাড়াও সংক্রমিত বেড়াল, বেজি, হনুমান, বাঁদর, শেয়াল, নেকড়ে প্রভৃতি উষ্ণ রক্তের প্রাণীর কামড়ে জলাতঙ্ক হতে পারে। বছরে ভারতে

অন্তত দেড় কোটি কুকুরের কামড়ের কথা জানা যায়। জলাতঙ্ক মারণঘাতী রোগ, কোন ওষুধ নেই, হলে বাঁচানো যায় না। তবে এর প্রতিষেধক টিকা ও ইমিউনোগ্লোবিন আছে যা দ্রুত ও ঠিকভাবে নিলে জলাতঙ্ককে প্রতিহত করা যায়।

কেউটে সাপ, বিষধর

শঙ্খচূড় সাপ, বিষধর

একধরনের র‍্যাবডোভাইরাস (লিসাভাইরাস, টাইপ ওয়ান) এই রোগের কারণ যা সংক্রমিত পশুর লালায় থাকে। এছাড়া স্নায়ুতন্ত্র, মূত্র, লসিকা ও স্তন দুগ্ধে থাকতে পারে। সংক্রমিত পশুর কামড় বা চাটা বা আঁচড় থেকে এই ভাইরাস অন্য পশুর বা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সংক্রমিত কুকুর/বেড়াল/অন্য পশু কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে, আঁচড়ালে ও সেখানে ক্ষত হলে কিংবা থেকে যাওয়া ক্ষতস্থানে চেটে দিলে সেখানকার মাংস পেশি ও কানেকটিভ টিস্যুতে ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। তারপর ভাইরাসগুলি প্রান্তিক নার্ভগুলোর মাধ্যমে সুষন্মা কাণ্ড হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তারপর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিন থেকে কয়েক বছর, সাধারণত ২০-৬০ দিনের মধ্যে, রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েক প্রজাতির বাদুড় থেকে জলাতঙ্ক হতে পারে।

প্রথম তিন-চারদিন মাথা ব্যথা, গা ব্যথা, জ্বর, কামড়ের জায়গায় ব্যথা হয়। পরবর্তীতে রোগ ছড়িয়ে পড়লে স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং সামান্য শব্দ, স্পর্শ, বাতাসে অথবা জল দেখলে প্রবল অসহিষ্ণুতা ও কাঁপুনি শুরু হয়। মাংসপেশি সংকুচিত ও অবশ হয়, তারপর খিঁচুনি। অজ্ঞান হয়ে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আগেই বলেছি এর কোন চিকিৎসা নেই, তবে প্রতিষেধক টিকা আছে।

কামড়কে তিনভাগে ভাগ করা হয়। **ক্যাটেগরি এক** হল শুধুমাত্র চাটা যেখানে চামড়া অক্ষত। সেক্ষেত্রে কিছু করার প্রয়োজন নেই। **ক্যাটেগরি দুই** যেখানে নখের খোঁচায় বা আঁচড়ে চামড়ায় ছেদ হয়েছে সেখানে অন্তত ১৫ মিনিট ক্ষতস্থান ভালো

করে ধুয়ে দিতে এবং অ্যান্টি রেবিজ ভ্যাক্সিনের ডোজ শুরু করতে হবে। ধোয়ার সময় সাবান দিয়ে ধুলে আরও ভালো। **ক্যাটেগরি তিন** যেখানে এক বা একাধিক কামড়/আঁচড় বা দুইয়ের কারণে ক্ষত সৃষ্টি। সেক্ষেত্রে ভালো করে ক্ষত পরিষ্কারের সঙ্গে ক্ষতস্থানে র‍্যাবিজ ইমিউনোগ্লোবিউলিন (৪০ আই.ইউ. ইকিউন অথবা ২০ আই.ইউ হিউম্যান/প্রতি কেজি দেহের ওজনে) দিতে হবে এবং অ্যান্টি র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন চার থেকে পাঁচটি ডোজ নিতে হবে। এক মিলিলিটার ডোজ মাংসপেশিতে ০,৩,৭,১৪ ও ২৮ দিনে। চামড়ার মধ্যে (Intradermal) দিলে ০.১ মিলিলিটার করে দু জায়গায় চারবার (০, ৩, ৭ ও ২৮ দিন) দিলে হয় এবং অনেকটা ভ্যাক্সিন ও অর্থ সাশ্রয় করা যায়। গর্ভবতী মহিলাদেরও দেওয়া হয়।

কালাচ সাপ, প্রবল বিষধর

শাখামুটি সাপ খুব শান্ত, কিন্তু বিষধর

জলাতঙ্ক নিবারণে বেওয়ারিশ পথ কুকুর ও বেড়াল নির্মূল এবং গৃহপালিত কুকুর-বেড়াল-অন্য প্রাণী নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। উন্নত দেশগুলোর মত কোন নাগরিক নিয়ম মেনে স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতে লাইসেন্স করিয়ে তার গৃহে বা খামারে কুকুর বেড়াল পুষতে পারবেন। তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা ও টিকার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় উদ্যানে বন্যজন্তু থাকবে। এর বাইরে রাস্তাঘাটে স্টেশনে বাজারে যত্র তত্র কুকুর বেড়াল ইত্যাদি থাকতে পারবে না। গৃহপালিত কুকুর-বেড়ালকে পাবলিক প্লেসে নিয়ে গিয়ে মূলমূত্র ত্যাগ করানো যাবে না। বেওয়ারিশ কুকুর-বেড়ালকে বিশেষ পদ্ধতিতে নিধন (culling) করতে হবে নতুবা সরকারি বেসরকারি ডগ পাউণ্ডে টিকা দিয়ে বন্ধ্যাত্ব অস্ত্রোপচার করে আমৃত্যু রাখতে হবে। এর ফলে কুকুর-বেড়ালের কামড় ও জলাতঙ্ক রোগ নিয়ন্ত্রণ (Control) করার সঙ্গে সঙ্গে পশুদের মলমূত্র বীর্য লোম ইত্যাদি থেকে

পরিবেশকেও অনেক পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে যাতে কুকুরের কামড়ে ঝাড়ফুঁক, থালাপড়া ইত্যাদিতে মূল্যবান সময় নষ্ট না করে দ্রুত নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাপের কামড়ের সমস্যা

পরিসংখ্যান বলছে মাত্র ৭ শতাংশ সাপের কামড় নথিভুক্ত হয় এবং মাত্র ২২ শতাংশ সাপের কামড় চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে আসে। এরপরেও বছরে আমাদের দেশে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ সাপের কামড়ে মারা যান যার মধ্যে ৬৬ শতাংশ কালাচ সাপের কামড়ে। ভারতে প্রায় ২৫০ প্রজাতির সাপ আছে তার মধ্যে ৬০টির মত বিষধর প্রজাতির। এর মধ্যে আবার ৫০টির মত সামুদ্রিক বিষধর সাপ যাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসা প্রায় অসম্ভব। সাধারণ মানুষ বিশেষত গ্রামের ও অরণ্যচারী কৃষক, পশুপালক, কাঠুরে, মউলে, পাতা কুড়ানি, মৎস্যজীবী প্রমুখরা মারা যান কর্মক্ষেত্রে বিষধর সাপের কাছাকাছি চলে এসে। মূলত 'স্পেকটাক্লেড কোবরা' (গোখরো, খরিশ, গোমো), 'মোনোক্লেড কোবরা' (কেউটে, খরিশ, গোমো), 'কিং কোবরা' (শঙ্খচূড়, রাজ গোখরো), 'কমন ক্রেইট' (কালাচ, কালাচিতি, ডোমনাচিতি, শিয়রচাঁদ, ঘামচাটা), 'ব্র্যাণ্ডেড ক্রেইট' (শাখামুটি), 'ব্ল্যাক ক্রেইট' (কাল কেউটে), 'ওয়াল'স সিণ্ড ক্রেইট', 'রাসেল'স ভাইপার' (চন্দ্রবোড়া),

চন্দ্রবোড়া সাপ, বিষধর

'শ স্কেলড ভাইপার' (ফুরশা), 'হাম্বনোস পিট ভাইপার' এই বিষধর সাপগুলো আমাদের দেশে দেখা যায়। এরমধ্যে শঙ্খচূড় গভীর জঙ্গলে থাকে সাধারণের সঙ্গে সংস্পর্শ হয় না এবং শাখামুটি খুব শান্ত স্বভাবের সাপ কাউকে কামড়েছে শোনা যায় না। দার্জিলিঙ পাহাড়ে 'মাউন্টেন পিট ভাইপার' (গুরবে) নামক এক বিষধর

সাপের কথা শোনা যায়। বর্ষা বন্যা প্লাবনে সাপের কামড় বাড়ে। শীতে কামড়ের সংখ্যা কমে যায়। সাপ কম্পনের মাধ্যমে অনুভব করে। শুনতে পায় না। কম দেখতে পায়।

পশ্চিমবঙ্গের ছটি প্রধান বিষধর সাপের মধ্যে কালাচ, কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড় ও শাখামুটির বিষ দেহের স্নায়ুতন্ত্র অবশ করে (Neurotoxic)। এদের মধ্যে গোখরো, কেউটে ও শঙ্খচূড়ের ফণা (Hood) আছে, আর কালাচ ও শাখামুটির ফণা নেই। চন্দ্রবোড়া দেহের রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করে (Haematotoxic), এছাড়াও এরা কিছু মাত্রায় স্নায়ুতন্ত্রকে অবশ করে। ‘গ্রিন পিট ভাইপার’ (গেছো বোড়া) সামান্য মাত্রায় নিউরোটক্সিক। ‘ইন্ডিয়ান রক পাইথন’ (ময়াল বা অজগর) বিষহীন কিন্তু শক্তিশালী মাংসপেশি দিয়ে পেঁচিয়ে শিকারকে জাপটে ধরে গিলে খায়। ‘মনিটর লিজার্ড’ (গোসাপ) ও ‘চ্যামেলিয়ন’ (তক্ষক) এর বিষ নেই, তারা সরীসৃপ কিন্তু সাপ নয়। সামুদ্রিক সাপ হৃদপিণ্ডের মাংসপেশিকে অবশ করে (Myotoxic)। প্রচলিত অ্যান্টিভেনম সেরামে কাজ হয় না। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে দেখতে পাওয়া ঘরচিতি, দাঁড়াশ, জলঢোঁড়া, লাউডগা, হেলে, বেতআঁচড়া, কালনাগিনী প্রভৃতি সাপ বিষহীন। দাঁড়াশ বাড়ির আশপাশে ও ক্ষেতে থাকে এবং ইঁদুর খেয়ে কৃষকের অনেক উপকার করে। সাপ নিরালায় থাকা (elusive) অন্যকে এড়িয়ে চলা (reclusive) প্রাণী। মানুষ একদম কাছে চলে এলে অথবা মানুষের দ্বারা সরাসরি বা দুর্ঘটনাবশত আক্রান্ত হলে বা আক্রমণের পরিস্থিতি হলে কামড়ায়। কেবলমাত্র কালাচ রাতে ঘুমন্ত মানুষের গা বেয়ে উঠে কামড়ায় এবং কামড়ের চিহ্নও পাওয়া যায় না। দেরিতে পেট ব্যথা, বারবার পায়খানার উপসর্গ নিয়ে রোগী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায়, কামড় ধরা পড়ে না, প্রবল বিষক্রিয়ায় মারা যায়। টিকটিকিভুক ঘরচিতি সাপ ঘরের আনাচে কানাচে থাকে। ঘরচিতি সাপ খেতে ভয়ানক বিষধর কালাচ সাপ রাতে ঘরে ঢোকে কিংবা মাটির বাড়িতে দেওয়ালের ফাটলে থেকে যায়। সম্ভবত মানুষের ঘাম ইত্যাদিতে কালাচ আকৃষ্ট হয়। সেইসময় ঘুমের ঘোরে তার গায়ে হাত পড়ে গেলে বা সরাতে গেলে কামড় দেয়। মাটিতে না শুয়ে খাটে, তক্তপোষে বা মাচায় শুলে ও মশারি ব্যবহার করে ঠিকমত গুঁজে নিলে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। শাখামুটি কালাচ সাপ খায়। অকাতরে শান্ত স্বভাবের সুদর্শন শাখামুটি সাপ হত্যা কালাচ সাপ বৃদ্ধির একটি কারণ।

নিউরোটক্সিক বিষে কামড়ের স্থানে প্রবল ব্যথা ও ফুলে যাওয়া, চোখ বন্ধ হয়ে আসা, ঝাপসা দেখা, মুখমণ্ডল অবশ হওয়া, কথা জড়িয়ে আসা, শ্বাস কষ্ট,

পেট ব্যথা, লালা ঝরা, দেহ অবশ হয়ে যাওয়া, অজ্ঞান হয়ে শেষে মৃত্যু হয়। হেমাটটক্সিক বিষে চামড়ার উপর লালচে দাগ হয়, পরবর্তীতে নাক, মুখ প্রভৃতি দৈহিক ছিদ্রগুলো থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে, দেহের মধ্যেও রক্তক্ষরণ হয়, কিডনি সহ অঙ্গগুলো বিকল হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

বিষধর সাপের কামড়ে রোগীর দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে রোগীকে বাঁচানো যায়। ওঝা বদ্যি ঝাড়ফুঁক করে দেরিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে আনলে রোগীর বিপদ বাড়ে। যে কোন সাপে কামড়ালেই রোগীকে আশ্বস্ত করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সাপের কামড়ে অনেকে খুব ভীত হয়ে পড়েন। সেই কারণেও গুরুতর সমস্যা হতে পারে। তাই তাদের আশ্বস্ত করার, তাদের সাথে কথা বলে সজাগ রাখার প্রয়োজন আছে। ক্ষতস্থান যতটা সম্ভব না নাড়িয়ে হাল্কা স্প্লিন্ট (Splint) সাপোর্ট দিয়ে নিয়ে গেলে ভালো, বাঁধনের কোনো ভূমিকা নেই। বেশি নাড়াচাড়া করলে লসিকার মাধ্যমে বিষ দ্রুত ছড়ায়। বাঁধন দেওয়া থাকলে চিকিৎসা শুরু করার পর আস্তে আস্তে খুলতে হবে। সমস্ত সাপে কামড় দেওয়া রোগীকে একদিন অন্তত হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত। বিষের লক্ষণ দেখা গেলে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ইঞ্জেকশন অ্যান্টি ভেনম সেরাম (এ.ভি.এস.) দিয়ে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা উচিত এবং এভিএস এর মাত্রা রোগীর দেহে বিষক্রিয়ার মাত্রার সাথে বাড়াতে কমাতে হবে। এর সঙ্গে সাকশান, অক্সিজেন, ড্রিপ প্রভৃতি এমার্জেন্সি সাপোর্ট দিতে হবে। নিউরোটক্সিক বিষে এট্রোপিন ও নিওস্টিগমিন ইঞ্জেকশন সঠিক ডোজে ব্যবহার করতে হবে। আপৎকালীন ব্যবস্থার জন্য অ্যাড্রিনালিন, আম্বু ব্যাগ এবং লাইফ সাপোর্টযুক্ত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সাপের কামড় প্রতিরোধে গৃহ এবং গৃহের আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ফাটল ও গর্তগুলো বুজিয়ে দিতে হবে। চলার পথে বিশেষত ভোরে, সন্ধ্যায় ও রাতে সাবধানতা বজায় রাখতে হবে। টর্চ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। যাত্রাপথে লাঠি ব্যবহার করলে মাটির সাথে লাঠির সংস্পর্শে উৎপন্ন কম্পনে সাপ সরে যেতে পারে। ফুল প্যান্ট ও জুতো-মোজা পরে থাকলে অনেক নিরাপদ। ভিয়েতনাম, চিন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ এবং আমাদের কেরল রাজ্যের মত কৃষকদের গামবুট এবং মৎস্যজীবীদের জাল ফেলা ও গোটানোর সময় গ্লাভস ব্যবহার করলে সর্পদংশনের প্রকোপ কমবে। দাঁড়াশ, শাখামুটি প্রমুখ সাপ, বেজি প্রভৃতি সংরক্ষণ করলে কালাচ, কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়ার বৃদ্ধি কমবে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত উষ্ণতা সহনশীল এভিএস সহ ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের নিয়মিত ও পর্যাপ্ত, সরবরাহ রাখতে হবে এবং চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে কলমে

সাপের কামড়ের চিকিৎসার তালিম দিতে হবে। অন্যদিকে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য দপ্তর প্রভৃতির সাহায্যে মানুষকে সচেতন করতে হবে সাপের কামড়ে ঘাবড়ে না গিয়ে ওঝা-বদ্যির কাছে সময় নষ্ট না করে রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসতে। ওঝা-বদ্যিদেরও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য সহায়ক হিসাবে নিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে তারা সাপের কামড়ে মানুষকে বুঝিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসবেন এবং গ্রামাঞ্চলে এ.এন.এম., আশা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজে সহায়তা করবেন।

সাপের কামড়ের চিকিৎসা নিয়ে আরও গবেষণা এবং পশ্চিমবঙ্গে সরকার নিয়ন্ত্রিত সাপের বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র ও এ.ভি.এস. উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ঘোড়ার রক্তে প্রস্তুত অনেক ক্ষেত্রে তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী এ.ভি.এসের উন্নত সংস্করণের এবং/অথবা উন্নত বিষনিষ্ক্রিয়কারী ওষুধ তৈরি সময়ের দাবি। স্কুলের পাঠক্রমে কুকুর ও সাপ কামড়ের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান বিষয়ে এবং স্নাতকস্তরে মেডিকেল শিক্ষাক্রমে কুকুর ও সাপ কামড়ের চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০২২)

ইঁদুর, ছুঁচো, কাঠবেড়ালি প্রভৃতির কামড়ে কি করবেন?

সাধারণত গৃহ (Domestic) ও গৃহসংলগ্ন (Peri-Domestic) এই ছোট প্রাণীগুলির কামড় থেকে জলাতঙ্ক হয়েছে রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। কিন্তু এই নিয়ে সারভাইলেন্স তথ্য ও গবেষণা যেহেতু এখনবধি সীমিত ও অসম্পূর্ণ এবং এগুলিও গরম রক্তের প্রাণী (Warm Blooded Animals), অন্যদিকে জলাতঙ্ক প্রায় ১০০ শতাংশ মারণঘাতী, তাই টিটেনাস টক্সয়েডের পাশাপাশি জলাতঙ্কের টিকা নেওয়া উচিত। মেঠো ইঁদুর (Rat), বনে থাকা এই ধরনের প্রাণীদের (Wild Animals) কামড়ের ক্ষেত্রে জলাতঙ্কের টিকা নিতেই হবে।

কুকুর কামড়ালে করণীয়

১) সাবান ও জল দিয়ে, সবচাইতে ভাল জোরালো ট্যাপ ওয়াটারে অন্তত ১৫ মিনিট ধরে ক্ষতস্থান ধোয়া।

২) তারপর স্পিরিট বা পভিডিন আয়োডিন লাগানো।

৩) নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে দেখানো।

অন্যান্য প্রাণীর হুল ফোটানো ও কামড় সম্পর্কে

অরূপ আঢ্য

কাঁকড়া বিছা (Scorpion) সহ অন্যান্য বিছার (Centipede) হুল ফোটানো: বহু ধরনের বিছার মধ্যে ২৫টি প্রজাতির প্রবল বিষ (Venom) রয়েছে। এই বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে অটোনমিক নার্ভের অন্তে ধারাবাহিক ডিপোলারাইজেশন সৃষ্টি করে। তীব্র ব্যথা, ফোলা, লাল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে হুল ফোটানোর জায়গা ও আশপাশটা অবশ হয়ে যায়। কারো ক্ষেত্রে ঝিনঝিন করে।

সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়। প্রান্তিক রক্তনালীগুলি সঙ্কুচিত হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি, শ্বাসনালীগুলি বৃদ্ধি পায়, শ্বাসের গতি বৃদ্ধি হয়, চোখের মণি বড় হয়ে যায়, দেহে কাঁপুনি হতে পারে এবং রোগী ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, লালা নির্গত হয়, অতিরিক্ত ঘাম হয়, বমি হতে পারে। ফুসফুসে জল জমতে পারে।

বিছার হুল ফোটানো জনিত সমস্যাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। (১) ‘ক্যাটাগরি এক’ এ হুল ফোটানোর জায়গায় সমস্যা হয়। (২) ‘ক্যাটাগরি দুই’তে এর সাথে মৃদু থেকে মাঝারি শারীরিক সমস্যা হয়। (৩) ‘ক্যাটাগরি তিন’এ মারাত্মক সমস্যা হয় যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

‘ক্যাটাগরি একে’র চিকিৎসার ক্ষেত্রে হুল ফোটানার জায়গায় বরফ বা ঠাণ্ডা জলের প্যাক লাগাতে হবে। লিগনোকেন জেল মলম বা ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে। প্যারাসিটামল জাতীয় ব্যথার ওষুধ ও ও.আর.এস. দেওয়া যেতে পারে। টিটেনাস টক্সয়েডের বুষ্টার দেওয়া না থাকলে দিতে হবে। ‘ক্যাটাগরি দুই’তে এর সাথে হাসপাতালে ভর্তি করে আই.ভি. ফ্লুইড দিতে হবে। স্করপিয়ন অ্যান্টিভেনম থাকলে দিতে হবে নইলে প্র্যাজোসিন (৩০ মিউ গ্রাম/কি.গ্রা. ওজনে) দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। এর সাথে মিডাজোলাম বা ডায়াজিপাম দেওয়া যেতে পারে। ‘ক্যাটাগরি তিন’এ শকের চিকিৎসা করতে হবে, ভেন্টিলেটরের সাহায্য লাগতে পারে, ইঞ্জেকশন নাইট্রোগ্লিসারিন প্রয়োজন হতে পারে। ডা: হিম্মতরাও বাভাস্কার মহারাষ্ট্রে বিছার হুল ফোটানোর চিকিৎসার উপর বিস্তারিত গবেষণা করেন এবং চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচান।

মৌমাছির (Bee) হুল ফোটানো :

ব্যথা, ফোলা ও লাল হতে পারে হুল ফোটানোর জায়গা। এক্ষেত্রে সাবান জল দিয়ে ধুয়ে প্রদাহ দমনকারী মলম লাগানো যেতে পারে। ব্যথার ওষুধ প্যারাসিটামল, অ্যান্টি হিস্টামিনিক, টিটেনাস টক্সয়েড, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেডনিসোলন দিতে হতে পারে। গুরুতরভাবে বা অনেক মৌমাছি মিলে হুল ফোটালে অ্যানাফাইল্যাকটিক শক, বিষক্রিয়া ও শকের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তখন হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে জীবনদায়ী পরিষেবা দিতে হবে।

কাঁকড়াবিছা

মৌমাছি

বোলতা (Wasp), ভিমরুল (Hornet) প্রভৃতির হুল ফোটানো :

প্রবল যন্ত্রণা, ফোলা ও লাল হয়ে যায় হুল ফোটানোর জায়গা। হুল থাকলে তা তুলে ফেলার চেষ্টা করতে হবে এবং হুল ফোটানোর জায়গা ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। মৃদু অ্যাসিড ভিনেগার লাগানো যেতে পারে। এছাড়াও ব্যথার ওষুধ প্যারাসিটামল, অ্যান্টি হিস্টামিনিক, টিটেনাস টক্সয়েড ও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেডনিসোলন দিতে হতে পারে। অ্যানাফাইল্যাকটিক শক, বিষক্রিয়া সহ গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে জীবনদায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

বোলতা

মাকড়সা

পেডেরুস বিটল (Nairobi Fly) পোকার সংস্পর্শ :

গায়ে বা সংস্পর্শে এলে ঘষাঘষি করলে এক ধরনের টক্সিন বেরিয়ে এসে লম্বাটে ঘা তৈরি করে। গায়ের মধ্যে টিপে না মেরে বা ঘষাঘষি না করে ফু দিয়ে বা টোকা মেরে সরিয়ে দিতে হবে। রাতে আলোর নিচে বসা এড়িয়ে যেতে হবে, ফুল হাতা শার্ট পরতে হবে এবং রাতে মশারির মধ্যে ঘুমোতে হবে। চামড়ার সংস্পর্শে এলে সাবান জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে চুন লাগানো যেতে পারে। ঘা হলে তার চিকিৎসা করতে হবে। প্যারাসিটামল, অ্যান্টিহিস্টামিনিক, অ্যান্টিবায়োটিক প্রভৃতি প্রয়োজন হতে পারে। চোখের সংস্পর্শে এলে ভালো করে ধুয়ে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ দিতে হবে। গুরুতর সমস্যা হলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

পেডেরুস বিটল

মাকড়সার (Spider) কামড় :

কামড়ের জায়গায় যন্ত্রণা, অবশতা, ফোলা, লাল হওয়া এবং ঘায়ের মত হতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট বন্ধ হতে পারে বা হৃদপিণ্ড অচল হয়ে যেতে পারে। ব্ল্যাক উইডো ও ব্রাউন রেকলুস দুটি মারাত্মক প্রজাতি। ব্রাউন রেকলুসের কামড়ে কিডনিও বিকল হতে পারে।

সাধারণভাবে ক্ষতস্থান ভালো করে ধুতে হয়। রোগীকে শুইয়ে কামড়ের হাত বা পা টিকে একটু তুলে রেখে বরফ প্যাক দিতে হয়। প্যারাসিটামল, অ্যান্টি হিস্টামিনিক, টিটেনাস টক্সয়েড এবং অ্যান্টি বায়োটিক দিতে হয়। গুরুতর সমস্যা হলে হাসপাতালে ভর্তি করে জীবনদায়ী চিকিৎসা করতে হয়।

বেজি (Mongoose), খেকশিয়াল (Fox), পাতিশিয়াল (Jackal), বাদর (Monkey) হনুমান (Langur), বুনো কুকুর (Indian Wild Dog or Dhole), নেকড়ে (Wolf), হায়না (Hyenas), ভালুক (Sloth, Himalayan Black & Brown Bears) প্রভৃতির কামড় :

ক্যাটেগরি তিন কুকুর কামড়ের চিকিৎসা করতে হবে। অর্থাৎ ক্ষতস্থান ভালো করে ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানে ইমিউনোগ্লোবিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে। টিটেনাস ইঞ্জেকশন দিতে হবে এবং অ্যান্টি রেবিজ ভ্যাকসিন চালু করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান ও অন্যান্য ক্ষত এবং রক্তপাত সহ শারীরিক সমস্যাগুলির চিকিৎসা করতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক প্রভৃতি দিতে হবে। গুরুতর ক্ষত প্রভৃতি কারণে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে জীবনদায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

বাঘ (Tiger Bite) ও চিতাবাঘের কামড় (Leopard Bite) :

উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলমহলের অরণ্যে ভালুক, নেকড়ে, হায়না প্রভৃতি জানোয়ার আর চোখেই পড়ে না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্সের জঙ্গলগুলিতে প্রচুর চিতাবাঘ এবং দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের জঙ্গলে রয়াল বেঙ্গল টাঁইগার রয়েছে। ভূটানের জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে বাঘ উত্তরবঙ্গের জঙ্গলগুলিতে চলে আসে। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেলে বা চোরাশিকার সহ অন্য কাজে গেলে কিংবা জঙ্গল সংলগ্ন চা বাগানে স্ত্রী চিতাবাঘের প্রসব ও শাবক পালনের সময় তাদের খুব কাছে চলে গেলে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। ভয়, মানসিক আঘাত, শারীরিক আঘাত ও প্রবল যন্ত্রণা, দেহের বিভিন্ন স্থানে গভীর ক্ষত, প্রচুর রক্তপাত, ক্ষতে সংক্রমণ ও পচন প্রভৃতি কারণে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

সুন্দরবনের বাঘ অত্যন্ত ক্ষিপ্র, ধূর্ত, হিংস্র, সুদর্শন ও শক্তিশালী। প্রাকৃতিক কারণে এবং মনুষ্যকৃত অরণ্য ধ্বংসের কারণে তারা খাদ্য ও পানীয় জলের সঙ্কটে ভোগে। এছাড়াও রয়েছে নিরন্তর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলোচ্ছ্বাস। সেই সময় অথবা বাদাবনে মানুষ কাঠ কাটতে, মধু সংগ্রহ করতে কিংবা জঙ্গলের মধ্যেকার নদী ও খাঁড়িতে মাছ ধরতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বাঘ আক্রমণ করে ধরে তাদের জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে ঠিকমত ধরতে না পারলে বা সঙ্গীসাথীরা হাতিয়ার দিয়ে তার সাথে লড়াই করে ফিরিয়ে আনলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গভীর ক্ষত, প্রবল রক্তক্ষরণ প্রভৃতি কারণে আক্রান্তের মৃত্যু ঘটে। আবার অনেক সময় খাদ্যের সন্ধানে বাঘ বা চিতাবাঘ জঙ্গল পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে এলে তাদের সাথে মানুষের সঙ্ঘর্ষ হয়।

বাঘ ও চিতাবাঘের কামড়ে মেডিসিন, সার্জারি, অর্থোপেডিক্স ও জীবনদায়ী চিকিৎসার, প্রয়োজনে রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতির সাথে ক্যাটেগরি তিন কুকুরের কামড়ের চিকিৎসা করতে হবে।

কুমিরের কামড় (Crocodile Bite) :

নদীমাতৃক সুন্দরবনে বিশেষত পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি ব্লকে এটি একটি সমস্যা। গরীব মানুষ জীবিকার জন্য নদী তীরে মাছ ধরেন, মহিলারা হাঁটু বা কোমর জলে দাঁড়িয়ে বাগদা চিংড়ির মিন ধরেন। কুমির অনেক সময় কামড়ে জলের মধ্যে নিয়ে যায় অথবা ধারালো দাঁত দিয়ে পায়ের পেশি ইত্যাদি খুবলে নেয়। কুমিরের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এলেও অনেক সময় গভীর ক্ষত, রক্তক্ষরণ প্রভৃতি কারণে মৃত্যু হয়।

কুমিরের কামড়ে মেডিসিন, সার্জারি, অর্থোপেডিক্স ও জীবনদায়ী চিকিৎসার সাথে প্রয়োজনে রক্তসঞ্চালন করতে হবে। ক্ষতস্থানে ইমিউনোগ্লোবিন ইঞ্জেকশন ও টিটেনাস টক্সয়েড দিতে হবে।

(সূত্র: মেডিকেল অফিসারস' ট্রেনিং মডিউল অন ম্যানেজমেন্ট অফ স্নেক বাইট, অ্যানিমাল বাইট অ্যাণ্ড কমন পয়জনাস বাইটস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর, ২০২২)

সাপ কামড়ালে করণীয়

১) রোগীকে আশ্বস্ত করা কারণ বেশিরভাগ সাপ বিষহীন
২) কামড় দেওয়া অঙ্গ বেশী নাড়াচড়া না করা
৩) উপুড় করে বাঁ দিকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে নাকের ফুটো ও মুখ খুলে রাখা
৪) মুখে খাবারের সাথে জল না দেওয়া অথবা খুব কম দেওয়া
৫) পোশাক, জুতো, অলঙ্কার ইত্যাদি ঢিলা করে দেওয়া বা খুলে রাখা
৬) বাঁধন না দেওয়া
৭) ক্ষতস্থানে কিছু না করা
৮) ওঝা বদ্যির কাছে না নিয়ে যাওয়া, তাদের কোন ভূমিকা নেই
৯) দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

বিষধর সাপ কামড়ের লক্ষণ

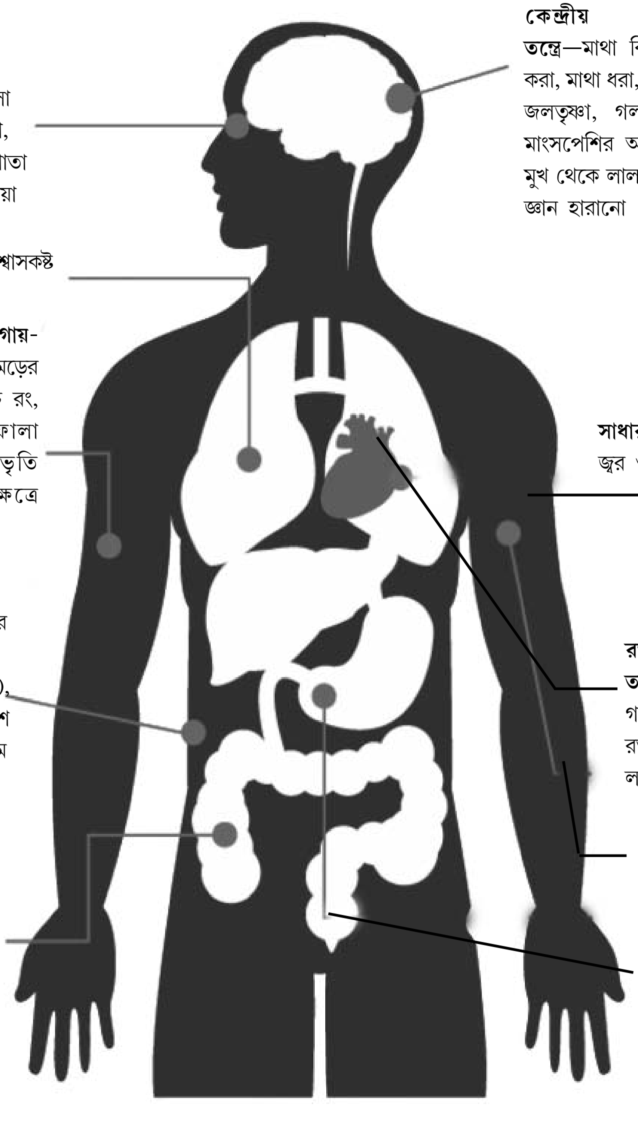

সাপ কামড়ের সমস্যা

দয়ালবন্ধু মজুমদার

জন স্বাস্থ্যের কয়েকটি বহুল আলোচিত সমস্যার বাইরে সাপ কামড়ের সমস্যা বহুদিন-ই উপেক্ষিত থেকে গেছে। এর প্রধান কারণ হল এই সমস্যাটি প্রায় সর্বাংশে গ্রামীণ সমস্যা। গ্রামের চাষি, ক্ষেত মজুর, জেলে এই সব প্রান্তিক মানুষগুলিই সাধারণত সাপের কামড়ে মারা যান।

যদিও অত্যন্ত হাস্যকর রকমের কম করে দেখানো হয়েছে, তবুও ২০০৭ সালের সরকারি হিসাবেও সাপ কামড়ে মৃত্যু সংখ্যা ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর প্রায় চার গুণ। দেখুন, এ রাজ্যে ম্যালেরিয়ার জন্য রাজ্যস্তরে ৩-৪ জন আধিকারিক আছেন, প্রতি জেলায় একজন করে উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক আছেন। অথচ সাপ কামড়ের সমস্যা দেখার জন্য এ রাজ্যে কোন একজনও আধিকারিক নেই।

অতি সম্প্রতি সামান্য হলেও আশার আলো দেখা যাচ্ছে। এ রাজ্যের কলকাতার সদর দপ্তর এর কয়েকজন উচ্চ পদাধিকারী এই ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। ২০১২এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চালু হয়েছে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ।

সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবনে ছোট ছোট দলে ডাক্তারবাবুদের এই প্রশিক্ষণ চলবে। রাজ্যের কয়েক হাজার ডাক্তারবাবুদের এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করতে বহুদিন সময় লাগবে এটা বলা বাহুল্য। বর্তমান লেখক ওই প্রশিক্ষণ এর সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছে।

কি শেখানো হবে ওই প্রশিক্ষণ-এ।

সত্যি কথা বলতে কি, গত কয়েক বছরে সাপ কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন সাপ কামড়ের চিকিৎসার জন্য 'সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ' অর্থাৎ রোগ লক্ষণ দেখে চিকিৎসার পদ্ধতি মেনে চলা হয়। এতে সাপটিকে চেনা জরুরি নয়। বিষধর সাপ কামড়ের বিশেষ লক্ষণ দেখেই নিশ্চিতভাবে বোঝা সম্ভব কি জাতীয় সাপ কামড়েছে, তার জন্য কি চিকিৎসা দরকার।

সাপ বা সন্দেহজনক কিছু কামড়ালে সেই রোগীকে কিভাবে চিকিৎসা করা দরকার সে বিষয়ে একটি ফ্লো চার্ট তৈরি করা হয়েছে। চার্টটি দেখলে বোঝা যায়, এই চিকিৎসা পদ্ধতি খুব-ই সহজ।

আমরা প্রথমে এ রাজ্যের মাত্র ছয়টি বিষধর সাপকে চিনে নেওয়ায় চেষ্টা করি। প্রথমেই পরিষ্কার হওয়া জরুরি যে একজন প্রাণীবিদ্যা বিশারদের মতো বিস্তৃত জানার দরকার নেই। চিকিৎসার জন্য সামান্য কয়েকটি জিনিস জানতে হয়।

চিকিৎসার পরিভাষার সাপেদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়। নিউরোটক্সিক আর হেমোটক্সিক। নিউরোটক্সিক সাপ আবার দুই রকম, ফণাযুক্ত আর ফণাহীন। ফণাযুক্ত গোখরো আর কেউটে চিকিৎসার জন্য এক-ই সাপ। এদের বিষ নিউরোটক্সিক। ফণাযুক্ত এই সাপ দুটিকে আমরা সবাই চিনি। এদের ইংরেজিতে কোবরা বলা হয়। এদের কামড়ের লক্ষণ হল ভয়ংকর ব্যথা আর ক্রমবর্ধমান ফোলা। ফণাযুক্ত শঙ্খচূড় বা কিং-কোবরাও এই জাতীয় সাপ, তবে এ রাজ্যে বিরল।

ঘরচিতি সাপ, বিষহীন

জলঢোঁড়া সাপ, বিষহীন

নিউরোটক্সিক সাপ কামড়ের রোগী ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়বে, দুই চোখের পাতা পড়ে আসবে। রোগী ঝাপসা দেখবে। কথা জড়িয়ে আসবে।

ফণাহীন নিউরোটক্সিক সাপ কামড়ে ব্যথা ফোলা হবে না। চোখের পাতা পড়ে আসা এ ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণ। এখানেও কথা জড়িয়ে আসবে আর রোগী ঝিমিয়ে পড়বে। ফণাহীন নিউরোটক্সিক সাপ হল কালাচ আর শাখামুটি। এদের ইংরেজিতে বলা হয় ক্রেট।

শাখামুটি সাপটি চেহারায় বেশ বড়, গায়ের রং উজ্জ্বল হলুদ আর কালোর পর পর ব্যান্ড। খুব-ই শান্ত প্রকৃতির এই সাপ সাধারণত মানুষকে কামড়ায় না। পরিবেশ-এর ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই সাপ খুব জরুরি; কারণ এরা ভয়ংকর কালাচ সাপ খেয়ে তাদের সংখ্যা কমায়।

কালাচ একটি ভয়ংকর বিষধর রহস্যময় সাপ। ফণাহীন মাঝারি চেহারার এই সাপটির গায়ের রং কালো; কালোর উপর সরু সরু সাদা ব্যান্ড বা চুড়ি লেজের শেষ পর্যন্ত থাকে। দিনের বেলায় এদের প্রায় দেখাই যায় না। প্রায় সবক্ষেত্রেই

এরা রাতে খোলা বিছানায় কামড়ায়। এরা কেন খোলা বিছানায় উঠে আসে তা এখনো অজানা। এরা রহস্যজনক সাপ এজন্য-ই যে এদের কামড়ে কোন ব্যথা হয়না, অতি সূক্ষ্ম কামড়ের দাগ প্রায়-ই খুঁজে পাওয়া যায়না। রাত্রে বিছানায় কামড়ের ২ থেকে ২০ ঘণ্টা পর স্নায়ুতে বিষের লক্ষণ দেখা যায়। বিচিত্র সব রোগ লক্ষণ নিয়ে রোগী হাসপাতালে আসে। ভোর রাত্রে পেট ব্যাথার জন্য ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া রোগী সবথেকে বেশি পাওয়া যায়। এছাড়া গলা ব্যথা, গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা, খিঁচুনি, শুধুমাত্র দুর্বলতা অনুভব করা এরকম বিচিত্র সব লক্ষণ নিয়ে রোগী আসতে পারে। এসব লক্ষণ এর সাথে আগের রাত্রে মেঝেতে ঘুমানো এবং পরে দুই চোখের পাতা পড়ে আসছে দেখলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় কালাচ সাপে কামড়েছে।

ছয় নং সাপটি হল চন্দ্রবোড়া। এটিই পশ্চিমবাংলার একমাত্র হেমোটক্সিক সাপ। বর্তমানে এই চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়েই সব থেকে বেশি মানুষ মারা যাচ্ছেন। এই সাপটি মোটা চেহারার, বাদামী বা কাঠ রং-এর ফণাহীন সাপ। গায়ে চন্দন হলুদ চাকা দাগ দিয়েই এদের সহজে চেনা যায়। এরা ভাইপার গোষ্ঠীর।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে রোগীর রক্ত তঞ্চন-এর গন্ডগোল হয়। চিকিৎসায় দেরি হলে রোগীর কিডনি নষ্ট হতে থাকে, মূত্রে রক্ত এসে যায়। এর কামড়েও গোখরোর কামড়ের মতো ব্যথা আর ক্রমবর্ধমান ফোলা প্রাথমিক লক্ষণ। দাঁতের মাড়ি, পুরাতন ঘা, বা কাশির সাথে রক্ত পড়া রক্ততঞ্চন এর গন্ডগোল এর লক্ষণ। চন্দ্রবোড়া একমাত্র হেমোটক্সিক সাপ যার কামড়ে চোখের পাতা পড়ে আসে।

সাপ কামড় বা যে কোন সন্দেহজনক কামড়ের রোগী হাসপাতালে এলেই তাকে ভর্তি করে নিতে হবে। প্রথমেই একটি সাধারণ স্যালাইন আস্তে চালিয়ে দেওয়া হবে। আর দেওয়া হবে একটি টিটেনাস ভ্যাকসিন। রোগীর শ্বাস কার্য ঠিকমতো চলছে কিনা দেখে নিতে হবে। এ ব্যাপারটি সবার আগে দেখা দরকার।

এরপর আমরা দেখবো কোনরকম বিষের লক্ষণ আছে কিনা। প্রচন্ড ব্যথা আর ক্রমবর্ধমান ফোলা থাকলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় বিষধর সাপে কামড়েছে। দ্রুত একের চার ($\frac{১}{৪}$) এম. এল. অ্যাড্রেনালিন ইঞ্জেকশন চামড়ার তলায় দিতে হবে (বাকি অ্যাড্রেনালিন ইঞ্জেকসন সিরিঞ্জে টানা থাকবে) এবং সঙ্গে সঙ্গে ১০টি অ্যান্টি ভেনম সেরাম ওই চালু স্যালাইন এর বোতলে মেশানো হবে। এবার ওই এ.ভি.এস. যুক্ত স্যালাইন দ্রুত চালানো হবে, এক ঘণ্টার কম সময়ে ১০টি এ.ভি.এস. রোগীর রক্তে ঢোকা চাই। কোন রকম বাঁধন থাকলে এ.ভি.এস. দেওয়ার সাথে সাথে তা খুলে দেবেন। পরবর্তী উন্নতি লক্ষ্য করে পরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ধীর গতিতে

স্যালাইন চলতে থাকবে ২৪ ঘণ্টা। কালাচ কামড়ের ক্ষেত্রে ব্যথা ফোলা থাকবে না, চোখের পাতা পড়ে আসছে (Drooping of eyelids or Ptosis) দেখলেই এ.ভি.এস. দিতে হবে।

'চোখের পাতা পড়ে আসছে', এটি একটি অত্যন্ত জরুরি লক্ষণ। এই লক্ষণ দেখলেই একটি অ্যাট্রোপিন ইঞ্জেকশন শিরায় (আই.ভি.) দিতে হবে; তারপর তিন সি.সি. (৩ এম এল) নিওস্টিগমিন ইঞ্জেকশন শিরায় বা মাংস পেশিতে দিতে হবে। এই দুটি ইঞ্জেকশন একমাত্র ফণাযুক্ত সাপের কামড়ে কাজ করে। ফণাযুক্ত সাপের ক্ষেত্রে এই দুটি ইঞ্জেকশন দু ঘণ্টা পর আবার দেওয়া যায়।

সাপ কামড়ের একমাত্র ওষুধ এ.ভি.এস. ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি, তাই এর থেকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এজন্য এ.ভি.এস. যুক্ত স্যালাইন চলবার সময় রোগীর উপর সতর্ক নজর রাখতে হবে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কোনরকম লক্ষণ চোখে পড়লেই সিরিঞ্জে টানা অর্ধেক অ্যাড্রেনালিন ইঞ্জেকশন (০.৫ এম.এল.) আই.এম. (পেশিতে) দিতে হবে। এ সময় স্যালাইন সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। ৭-৮ মিনিট এর মধ্যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া চলে যাবে; তখন আবার স্যালাইন চলবে। খুব কম ক্ষেত্রেই ১৫ মিনিট পর আর একবার অ্যাড্রেনালিন ইঞ্জেকশন দরকার হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি হল আমবাত, মাথা চুলকানো, হঠাৎ করে রক্তচাপ কমে যাওয়া, বমি কিংবা পেট ব্যথা। খুব কম ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট দেখা যায়।

দাঁড়াস সাপ, বিষহীন

এখানে কোথাও স্কিন টেষ্ট এর কথা বলা হচ্ছে না। আগের দিনে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে কিনা জানার জন্য ওই রকম পরীক্ষা করা হত, এখন এটা পরীক্ষিত সত্য যে ওই রকম পরীক্ষা অর্থহীন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১০ সালের নির্দেশিকায় স্কিন টেষ্ট বাতিল করা হয়েছে।

বিষের লক্ষণ হিসাবে কোথাও সাপ চেনা কিংবা কামড়ের দাগ দেখার কথাও বলা হচ্ছে না। প্রথম ১০টি এ.ভি.এস. দেওয়ার সময় কোন জাতীয় সাপ বা কি জাতীয় বিষ আলাদা করার দরকার নেই। সবক্ষেত্রেই এক-ই চিকিৎসা। এমন কি বাচ্চাদেরও ওই ১০টি এ.ভি.এস.।

এবার চন্দ্রবোড়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ কি করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ক্ষরণ এর লক্ষণ দেখা যাবে। ১০ টি এ.ভি.এস. দেওয়ার পর রক্ত তঞ্চন-এর গন্ডগোল থেকে গেল কিনা তা জানার জন্য একটি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাটি হল ২০ ডব্লু.বি.সি.টি.; ২০ মিনিটে রক্ত তঞ্চন হল কিনা দেখতে হবে।

একটি শুকনো টেষ্ট টিউব বা কাঁচের ভায়ালে ২-৩ এম. এল. রক্ত (শিরা থেকে) টেনে রেখে দিতে হবে। ২০ মিনিট পর আস্তে কাত করে দেখতে হবে রক্ত তরল আছে না জমাট বেঁধেছে। রক্ত তরল থাকার মানেই হল আরও এ.ভি.এস. (১০টি) লাগবে।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডোজ এ.ভি.এস. ৬ ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে; এজন্য ওগুলি বড় হাসপাতালেই দেওয়া উচিত। বড় হাসপাতালের মানে হল যেখানে কিডনির সমস্যা এড়ানো সম্ভব; কিডনির সমস্যা হলে ডায়ালিসিস দরকার হয়।

এ.ভি.এস. দেওয়া হলে সেই রোগীকে ৪৮ ঘণ্টা ভর্তি রাখতে হবে, কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় কিনা দেখার জন্য। কিডনির সমস্যা হলে অথবা রোগী স্বাভাবিক না হলে ছুটি দেওয়া যাবে না।

একমাত্র প্রচুর ফোলা বা পচন থাকলেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে। অবশ্য-ই তা প্রথম ডোজ এ.ভি.এস. (১০টি) দেওয়ার পর। এ সকল ক্ষেত্রে সার্জেন এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

২-৪ দিন ফোলা থেকে গেলে ম্যাগসালফ কমপ্রেস কাজ দেয়।

শেষ করার আগে আবারও রহস্যজনক কালাচ সাপ সম্বন্ধে সাবধান। সব সময় খেয়াল রাখা প্রয়োজন প্রায়শ-ই রোগী কোনরকম কামড়ের কথা বলবেই না। বিচিত্র সব লক্ষণ এর পর দুই চোখের পাতা পড়ে আসছে দেখলে অবশ্যই কালাচ কামড়ের কথা চিন্তা করবেন।

চন্দ্রবোড়া সহ যে কোন সাপ কামড়ের ক্ষেত্রে প্রথম ১০ টি এ.ভি.এস. অবশ্যই ১০০ মিনিটের মধ্যে দিতে হবে।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, জুলাই ২০১২)

সাপ সমাচার

(‘যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা’, ক্যানিং-এর দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সংকলিত।)

২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় প্রধানত তিনটে বিষহীন সাপের কামড়ের ঘটনা জানা গেছে। সাপগুলি হল : **দাঁড়াস (Rat Snake)**, **ঘরচিতি (Wolf Snake)**, **জলঢোঁড়া (Checkered Keelback)**। বিষহীন সাপের মোট কামড় ঘটেছে ১১০০৯ জন ব্যক্তির। তার মধ্যে দাঁড়াস সাপের কামড় খেয়েছেন ১৯২৬ জন অর্থাৎ ১৭ শতাংশ, ঘরচিতি সাপের কামড় ২৬৯২ জন—২৪ শতাংশ, আর জলঢোঁড়া সাপের কামড় ঘটেছে ৫১২১—প্রায় ৪৭ শতাংশ। অন্যান্য কামড় ১২৭০—১২ শতাংশ। বোঝা যাচ্ছে বিষহীন **জলঢোঁড়ার কামড়** সর্বাধিক। এই সাপটি জলের সাপ, কিন্তু স্থলেও স্বচ্ছন্দ। প্রধানতঃ পুকুর, ডোবা, খাল, ড্রেন প্রভৃতি জায়গায় থাকে। দিনে ও রাতে সমান সক্রিয় যদিও আদতে সাপটি নিশাচর (Nocturnal)। খুব রাগী ও তেজী সাপ। সন্ধ্যায় হাত-পা ধুতে যাওয়ার সময় প্রায়শই কামড় ঘটে কিম্বা পুকুর, ডোবা, খাল প্রভৃতির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কামড় ঘটে। আবার স্নানাদির সময়ও আকছার কামড়ায়। জলের উৎস থেকে ২০-২৫ ফুটের মধ্যে কামড় সর্বাধিক। কামড় হয় গভীর, সাধারণতঃ অনেকগুলো দাঁতের দাগ আঁচড়ের আকারে চামড়ায় দেখা যায় এবং প্রচুর রক্ত বার হয়।

স্থলের দুটো সাপের মধ্যে অন্যতম **ঘরচিতি সাপ,** যার কামড় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এই সাপটির অপর আঞ্চলিক নাম ঘরগিন্নী অর্থাৎ ঘরের বৌ। ঘরসহ সংলগ্ন এলাকাতেই থাকে। প্রধানতঃ ঘরে টিকটিকি সহজলভ্য হওয়ায় যা এর প্রধান খাদ্য। কাজেই বিছানায়, ঘরের দেওয়ালে, বই এর তাকে, বারান্দায় এবং উঠোনের মধ্যে এর কামড় প্রায় সীমাবদ্ধ। অন্যটি নিশাচর সাপ, সন্ধ্যার দিকে খাদ্য অন্বেষণে বার হয় এবং কামড় ঘটে। ঘরচিতি এর খাদ্য। এটিও নিশাচর সাপ ও ঘরে থাকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যেকটা ব্লকেই এই সাপকে ঘিরে আশঙ্কা—সাপটি বিষধর **কালাজ বা কালাচ (Common Krait)**। শুধুমাত্র এই জেলা নয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার রিপোর্টও তাই যা জে. এস. এস. সি. পরিচালিত, সাপের কামড়ের হেল্প লাইন-এর তথ্য দ্বারাও প্রমাণিত। গ্রামবাসীরা ঘরচিতি সাপটিকে বলে খৈয়ে কালাজ। স্বভাবতই সন্ধ্যায় এই সাপের কামড় ঘটলে ভাবেন বিষধরে কেটেছে। লাইন দেন ওঝার কাছে। নিদান আসে—খৈয়ে কালাজের কামড়, বিষ

মাথায় উঠেছে, মন্ত্র পড়ে ও শেকড় খাইয়ে নামিয়ে দিচ্ছি। সাপ না চেনার ফলস্বরূপ গুণিনের প্রতি এই আস্থাই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে যখন বিছানায় কালাজ সাপের কামড় ঘটে। গ্রামবাসী সহ ওঝা ভাবেন—আগেরটা যখন ভালো হয়েছে, এটাও হবে। অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তবুও ওঝার প্রতি আস্থা কমে না, ডাক্তারবাবুও তো ভুল করেন। ঘরচিতি সাপ কালাজ সাপের মিমিক্রি বা সদৃশসাপ। প্রকৃতিতে প্রত্যেকটা বিষধর সাপের অপর মিমিক্রি বিষহীন সাপ রয়েছে। দুটো সাপের খানিকটা মিল থাকায় বিভ্রান্তি বাড়ে। ঘরের টিকটিকি খেতে ঘরচিতি আসে সন্ধ্যায়, রাতে ঘরচিতিকে খেতে কালাজ ঢোকে ঘরে। এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া গেছে যেখানে মশারির ভেতর ঘরচিতিকে তাড়া করছে কালাজ, ঘুমন্ত মানুষটার চারদিকে ঘুরছে। আধো জাগ্রত অবস্থায় মানুষ ভাবে—ইঁদুর। একসময় কালাজ মানুষটাকে কামড়ে পালিয়ে যায় যা এই সাপটার বৈশিষ্ট্যের একটা দিক। কামড় খেয়ে সে আরো ঘুমিয়ে পড়ে কারণ কালাজের বিষে একটা অধিবিষ (Toxin) আছে যা মানুষটাকে আরো গভীর ঘুমে নিয়ে যায়। দেড় থেকে দু-ঘণ্টা পর যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন বোঝে অসম্ভব পেট ব্যথা হচ্ছে আর মশারির ভেতর ঘরচিতি। সাপটাকে মেরে কেউ যায় ওঝার কাছে কেউবা হাসপাতালে। উভয় ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তি বাড়ে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল, বাসন্তী, কুলতলি, সাগর হাসপাতালে এই ধরনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে যেখানে শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরে চিকিৎসক তড়িঘড়ি AVS চালিয়েছেন। ঘরচিতি সম্পর্কে আরো বেশি করে জানা বোঝা দরকার সকলের।

হেলে সাপ, বিষহীন

বেতআঁচড়া সাপ, বিষহীন

এরপরে স্থলের তৃতীয় সাপ **দাঁড়াস**, বড়সড় চেহারা, ঘরে ঢোকে এই সাপটাও। প্রধানত ঘরে, জ্বালানির ভেতর, উঠোনে, বাগানে কামড় বেশি। দিনের বেলায় চলাফেরা করে ও কামড়ও বেশি হয়। কামড় গভীর হয়, অনেকটা জায়গায় জুড়ে

ক্ষত তৈরি হয়, অনেকগুলো আঁচড়ের মতো দাগ হয় ও প্রচুর রক্ত বার হয়। বাড়ির কাছাকাছি থাকায় একে বাস্তু সাপও বলে। ইঁদুর খেয়ে কৃষকের অশেষ উপকার করে।

অন্যান্য কামড় ঘটেছে ১২ শতাংশ। এই কামড়গুলো ঘটেছে **বেতআঁচড়া (Bronze Back Tree Snake), লাউডগা (Vine Snake), ক্ষেত মেটে (Banded Racer), মেটেলি (Common Water Snake), বিছা (Centipedes)** প্রভৃতিদের মাধ্যমে। প্রথম দুটো গাছের সাপ। **বেতআঁচড়া** সরু, লম্বায় ৩-৪ ফুট, বাদামি রং। **লাউডগা সাপ** আক্ষরিত অর্থেই লাউগাছের ডগার মতো সরু লম্বা, সবুজ রং। মুখের সামনের অংশটা সরু যা বকের ঠোঁটের মতো। এই দুটো সাপের মধ্যে বেতআঁচড়ার কামড় বেশি ঘটে প্রধানতঃ গাছে বা তার কাছাকাছি, এছাড়া অন্য কোথাও কামড় প্রায় ঘটেই না। লাউডগা সাপের এক ব্যতিক্রমী ও দুঃখজনক ঘটনা নজরে আসে সাগর ব্লকে—রামপ্রসাদ মান্না বয়স-১২, সরু, লম্বা একটা কঞ্চির লাঠি দিয়ে সাজিনা ডাটা গাছ থেকে টেনে নামাচ্ছিল মাটিতে দাঁড়িয়ে, সেই সময় খুব দ্রুততার সঙ্গে এক লাউডগা সাপ ওই আঁকশি বেয়ে হাঁ হয়ে থাকা মুখ হয়ে সরাসরি তীব্র বেগে পেটে ঢুকে যায়। প্রথমে জল খাওয়ানো চলে, এতে পেটের ভেতর ঢোকা সাপটি আরো কামড়াতে থাকে, মুখ থেকে রক্ত বার হতে থাকায় হাসপাতালে নিয়ে যায়। অত্যধিক রক্ত বমিতে ছেলেটি মারা যায় চিকিৎসার আগেই।

দুটো গাছের সাপের পর স্থলের আরো একটা সাপ **ক্ষেতমেটে** যা দেখতে দাঁড়াসের বাচ্চা বলে ভ্রম হয়। ক্ষেত বা জমিতেই থাকে, খুবই দ্রুতগতির সাপ, বিচ্ছিন্নভাবে যে কামড় ঘটে তা ধান জমিতেই।

জলের অপর সাপ **মেটেলি**। এই সাপটা জল-কাদায় থাকতে পছন্দ করে এবং কামড়ও ঘটে ওই সমস্ত স্থানেই। অতি নিরীহ, গায়ে পা-এর চাপ না পড়লে কামড়ায় না। কামড় হালকা ধরনের হয়, অনেক দাঁতের দাগ ও ছিটছিট রক্ত এই সাপের কামড়ের লক্ষণ।

সবশেষে **বিছার** কামড়। যদিও সাপের তালিকায় পড়ে না কিন্তু রাতে, অন্ধকারে বিছানায় কামড় ঘটে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে, তখন প্রচুর রকমের বিপত্তি ঘটতে থাকে। প্রাণ না গেলেও অর্থদণ্ড প্রচুর হয় হাসপাতাল বা ওঝার দৌলতে। যেহেতু বিছানায় কালাজ সাপের মতো বিছাকেও খুঁজে পাওয়া যায় না প্রায়শই, বাড়ে বিভ্রান্তি। তাই গ্রাম বা শহরবাসী সকলেরই এই প্রাণীটির কামড় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। কামড়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় জ্বালা ও অল্প ফোলা। কমবেশি ঘণ্টাখানেক থাকে এই জ্বালা কিন্তু কালাজের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না।

এছাড়াও আছে বিছানায় **ছোট ইঁদুরের (Mouse)** কামড়। পাশাপাশি দুটো দাঁতের দাগসহ যন্ত্রণা এবং বিছানায় কামড় হওয়ায় বিষধর সাপের কামড় ভেবে, সর্পাতঙ্কে ভোগেন হামেশাই মানুষজন যেহেতু দেখা যায় নি কামড় দেওয়া প্রাণীটিকে। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণই যথেষ্ট। ২০১১ সালের জুন মাসে ক্যানিং শহরে ভোরে এক বয়স্কা মহিলা, যিনি স্কুল শিক্ষিকাও বটে, যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার এক সদস্যর বাড়িতে এসে ডাকাডাকি শুরু করেন। আধো অন্ধকারে বাইরে

লাউডগা সাপ, বিষহীন

কালনাগিনী সাপ, বিষহীন

এসে ঘুম চোখে সেই সদস্য বলে—আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। বলার সঙ্গে সঙ্গেই অঝোরে কান্না। আমাকে চিনতে পারলেন না, আমি...। সদস্য লজ্জিত হয়ে আসার কারণ জানতে চান। বলেন—আপনার দাদাকে বিছানায় কী কামড়েছে, বসে আছে। আমাদের বাড়িতে চলুন। ভদ্রমহিলা ক্যানিং হাসপাতালকে বায়ে রেখে, আরো পাঁচ মিনিট দূরত্বে সদস্যের বাড়িতে এসেছেন। তাই জিজ্ঞাসা—হাসপাতালে এনেছেন? না, আপনি আগে বাড়িতে চলুন। সদস্য মহিলার সঙ্গে রওনা দেন, তিনি তখন যেন উড়ে চলেছেন যথেষ্ট ভারী চেহারা নিয়েও। সাত-আট মিনিট দূরত্বে বাড়ি। ভদ্রলোক WBCS, সেলস ট্যাক্সের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মী, সংস্থার কাজকর্মের সঙ্গে কমবেশি যুক্ত। বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, সোফায় হেলান দিয়ে বসে, মুখ পাংশুবর্ণ, পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় ইঁদুরের কামড়। হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলায়—নারাজ। সকাল ৯টার ট্রেনে কলকাতার অফিসে যাওয়ার পথে সংস্থার অফিসে দেখা করে আশ্বস্ত হয়ে ট্রেন ধরেন কিন্তু দুপুর ২-৩০-এ ক্যানিং ফিরে আসেন। শরীর ও মনটা কেমন কেমন করছিল তাই ফিরে এলাম, গল্প করে বাড়ি যাবো। 'কামড়'—এই তিন অক্ষর এমনই আচ্ছন্ন করে দেয় মন ও শরীরকে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যুক্তি-বুদ্ধি কাজ করে না। উক্ত ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে এমনটাই হয়।

নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষহীন সাপেরই কামড় ঘটে প্রায় নির্দিষ্ট এলাকা ও সময়ে। কোন পরিবেশে কখন কামড় তার থেকে ধারণা পাওয়া যায় কীসের কামড়। তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কামড়ের দাগ ও লক্ষণ সমূহকে। তাহলে অনেক বিপত্তি দূর হওয়া সম্ভব—এ ব্যাপারে পরে আরো আলোচিত হয়েছে।

সাপ কামড়ের সময়

সাপ সময় ধরে—এই আমি কামড়ালুম; বলেই দাঁত বসায় না এটা যেমন ঠিক, ঠিক তেমনি সমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা যায় কিছু বিষধরের একটা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যেই সাধারণতঃ কামড় ঘটে থাকে এমনকি বেশ কিছু বিষহীনের কামড়ের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। সঙ্গের সারণি লক্ষণীয়—

বিষধর-এর কামড়ের সময়

	ভোর ৪ -৮টা	বেলা ৯-১২টা	বিকাল ৪-৬টা	সন্ধ্যা ৬ -৮টা	বিছানায় রাত ১১- ভোর ৫টা	অন্যান্য সময়
কালাজ	-	-	-	-	৯৯%	১%
কেউটে	৫০%	-	৩০%	১৫%	-	৫%
চন্দ্রবোড়া	২০%	৪৫%	৩%	৩০%	-	২%

সাপের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

কামড় প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে সাপের শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক নয়। দেহের তাপমাত্রা সাপের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার বাঁচা-মরা-সক্রিয়তার ওপর। সাপকে বলা হয় এক্টোথার্মিক (Ectothermic) প্রাণী। শরীর আঁশে ঢাকা এবং ঘর্মগ্রন্থি না থাকায় পরিবেশের তাপমাত্রার ওঠানামার ওপর দেহের তাপমাত্রা নির্ভরশীল। ফলে তীব্র ঠাণ্ডায় বিপাকীয় ক্রিয়া কমে যাওয়ায় চলাফেরার ক্ষমতা হ্রাস পায় আবার তীব্র গরমে দেহ থেকে জল নিষ্ক্রমণ ঘটায় মারা যায়। প্রখর রোদে একটা সাপকে এক ঘণ্টা রেখে দিলে সে মারা যাবে। সাপ সাধারণতঃ ২১^{0}c থেকে ২৭^{0}c তাপমাত্রায় সক্রিয় থাকে। তাই অতিরিক্ত গরমের থেকে রেহাই পেতে ঠাণ্ডা জায়গায় বিশ্রাম নেয়। এই অবস্থাকে এস্টিভেশন (Estivation) বলে। এর ঠিক উল্টোটা ঘটে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বা শীতে। তাই ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে সাপ সারা শীতকাল উষ্ণ জায়গায় আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ গর্ত বা ফাটলে শীতকালটা কাটিয়ে দেয়। একেই বলে শীতঘুম

(Hybernation)। সেখানে তাপমাত্রা থাকে ৪^{0}c থেকে ১১^{0}c। কাজেই শীতকালে (ডিসেম্বর, জানুয়ারি) এবং প্রচণ্ড গরমে দুপুরে খোলামেলা জায়গায় সাপের কামড়ের সময় নয় এবং ঘটেও না। সাপের আরো একটা শারীরিক বৈশিষ্ট্য কিছু সাপ দিনের বেলা দেখতে পায় না আবার কিছু আছে যারা রাতে দেখতে পায় না। যারা রাতে সক্রিয় তদের বলে **নিশাচর** (Nocturnal) আর দিনে সক্রিয়দের বলে **দিবাচর** (Diurnal)। সাপের চোখ দেখে বোঝা যায় সাপটি রাতে চলাচল করে না দিনে। রাতে যে সব সাপ চলাচল করে তাদের তারারন্ধ্র উলম্ব (Elliptical)। দিনে চলাচলকারীদের তারারন্ধ্র (Pupil) গোলাকার বা অনুভূমিক। বেশিরভাগ সাপের চোখে ফোবিয়া সেন্ট্রালিস (Fovea centralis) (উন্নত প্রাণীদের থাকে) থাকে না। তার পরিবর্তে থাকে রড কোষ (Rod Cell) যা অল্প আলো বা অন্ধকারে দেখতে সাহায্য করে, এই ধরনের সাপেরা দিনের আলোয় ভালো দেখতে না পাওয়ায় রাতেই চলাচল করে। তাই বেশিরভাগ বিষধরই রাতে সক্রিয়। আর কিছু ধরনের সাপ আছে যাদের শুধু কোন্ সেল (Cone Cell) থাকায় উজ্জ্বল আলোতেই দেখতে পায়, রাতে একেবারেই দেখতে পায় না। বেশিরভাগ বিষহীন সাপ এই তালিকায় পড়ে।

গেছোবোড়া সাপ, সামান্য বিষ

উপরিউক্ত প্রেক্ষিতে অনেকটাই পরিষ্কার, বিষধর বা বিষহীন সবার ক্ষেত্রেই কামড়ের একটা সময়কাল আছে সাপেদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যজনিত কারণে। সমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে কালাজ সাপের কামড় ঘটেছে ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে রাতে বিছানায়। রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা অর্থাৎ ৬ ঘণ্টার মধ্যে এই কামড়গুলো ঘটছে। এক শতাংশ ক্ষেত্রে ঘরের ভেতর রাখা মাছ ধরার জালের ফাঁসে জড়িয়ে থাকা কালাজ সাপ কামড়েছে সকালে।

কেউটে সাপের সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত কামড় ঘটেছে ৩০ শতাংশ, ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কামড় ১৫

শতাংশ, ভোর ৪টা থেকে বেলা ৮টা পর্যন্ত কামড় হয়েছে ৫০ শতাংশ, অন্যান্য সময়ে কামড় ৫ শতাংশ।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড় খুবই বৈশিষ্ট্যময়। বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কামড় ৩৩ শতাংশ, ভোর ৪টা থেকে বেলা ৮টা পর্যন্ত ২০ শতাংশ আর বেলা ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ৪৫ শতাংশ কামড়, অন্যান্য সময়ে ২ শতাংশ।

আগেই বলা হয়েছে, বিষধর সাপেরা সূর্যের আলো কমে আসলে খাদ্য অন্বেষণে নড়াচড়া শুরু করে, আবার মেঘলা আকাশ থাকলেও বিষধর সাপ সক্রিয় হয়ে ওঠে। যারা মাঠে বা বাগানে কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রাক্ সন্ধ্যায় কেউটে সাপের কামড় ঘটছে বেশি। রাতে মানুষের চলাফেরা অনেক কমে আসে এবং প্রধানতঃ তখন মানুষজন রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন তাই কামড়ের সংখ্যাও কমতে থাকে। ঠিক উল্টোটা ঘটে ভোরবেলা, গ্রামীণ মানুষজন কৃষিকাজসহ অন্যান্য কাজে বার হন এবং ছড়িয়ে পড়েন মাঠে, বাগানে। ভোরে মহিলারাও ঘর-বারান্দা ঝাঁট দেওয়া বা গোবর দিয়ে মেঝে মোছার কাজে লিপ্ত হন ফলতঃ কামড় খান অনেক বেশি। প্রধানতঃ জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরে কামড় বেশি বর্ষাজনিত কারণে। এই কেউটে সাপের আরো বৈশিষ্ট্য জলা জায়গা পছন্দ করা মাছ ও ইঁদুরের আশায় এবং সূর্যালোক প্রবেশ করে না এমন ঝোপে বা গর্তে থেকে যায় দিনের বেলা। মানুষ কাজ করা বা হাঁটাচলা করার সময় সাপের কাছে পৌঁছে গেলে কামড় বসায়। যে কারণে ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত জলা জায়গা খুবই বিপদজনক। সূর্যের চড়া আলো গ্রাস করার আগেই আশ্রয়স্থলের জন্য তৎপর থাকে এই সময়ে। সমীক্ষার পূর্বে পর্যন্ত কোন ধারণাই ছিল না বেলার দিকেও চন্দ্রবোড়ার এত কামড় হতে পারে। সন্ধ্যা ও ভোরে বিষধর সাপের কামড় সঙ্গতিসূচক কিন্তু নিশাচর প্রাণী চন্দ্রবোড়া সাপ দিনের বেলাতেও কেন ও কীভাবে কামড়াচ্ছে, যেখানে সূর্যের প্রখর আলোতে ওরা প্রায় দেখতেই পায় না। এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর হয় না। সাপটির দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও বাসস্থান তথা দিনের আলোতে লুকানোর স্থান সম্পর্কে জানা-বোঝা প্রয়োজন। চন্দ্রবোড়া সাপ বেশ মোটাসোটা; আলালের ঘরের দুলাল যেন, অলস, এক জায়গায় চুপচাপ ক্যামোফ্লেজ করে থাকে শিকারের আশায়। সেখানে অন্যান্য সাপ সবসময়ে থাকে কমবেশি গতিশীল। থাকতে পছন্দ করে ছোট ছোট ঝোপ, উলুবন, বাঁশ বাগান প্রভৃতি জায়গায়। সন্ধ্যায় শিকারের সন্ধানে বার হয়ে দিনের আলোতে যখন তেজ বাড়তে থাকে, তখন অন্যান্য সাপ মরিয়া হয়ে লুকানোর গর্ত বা ফাটল খোঁজে। কিন্তু এই অলস চন্দ্রবোড়া সাপটি কাছাকাছি কোন ঝোপে যেখানে সূর্যের আলো বা তেজ কম লাগবে সেখানে শুয়ে

থাকে যেন মনে হয় মরে আছে। অনেক সময় পানা ভরা পুকুরে পানার ভেতর থেকে যায়। এইরকম স্যাতস্যাতে জায়গা পছন্দ করে। এমতাবস্থায়, গ্রামীণ মানুষজন যখন ঘরমুখো হয় বা বিভিন্ন কারণে হাঁটাচলাও বাড়ে তখন যদি রৌদ্রজ্জ্বল দিন হয় তবে ছায়া জায়গায় ঝোপ খুবই বিপদজনক হয়ে ওঠে চন্দ্রবোড়া প্রবণ এলাকায়। তাই বলা হয় যে জায়গা দেখতে পাচ্ছেন না সেখানে হাত বা পা নাড়াবেন না। এই সাপটির কামড় খাওয়ার প্রবণতা সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রেও একই ফলাফল দেখা যাবে। আর থাকে **গোখরো**। যার কামড় এই জেলায় না থাকায় সমীক্ষা তথ্য দেওয়া গেল না। তবে এই সাপ শুষ্ক জায়গায় পছন্দ করে। তাই বাড়ি ও বাগানের কাছাকাছি দেখতে পাওয়া যায় এবং উক্ত স্থানগুলোতেই ভোরে ও সন্ধ্যার দিকে কামড় ঘটার সম্ভাবনা।

বিষহীন সাপেদের মধ্যে নকটারনাল অর্থাৎ যারা সন্ধ্যায় বার হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘরচিতি। সন্ধ্যায় ঘরে, বারান্দায়, উঠানে ঘুরতে দেখা যায় এবং এই সময় হামেশাই কামড় ঘটে। অনেক সময় বিছানায় উঠে আসে এবং বিচ্ছিন্নভাবে কামড় ঘটে। সন্ধ্যা ৬-৯টা পর্যন্ত ৮০ শতাংশ এক্ষেত্রে এই সাপেরই কামড় ঘটে। জলঢোঁড়া জলে ও স্থলে, দিনে ও রাতে সমান সক্রিয় এবং ব্যতিক্রমী সাপ। সন্ধ্যায় পুকুরঘাটে বা সংলগ্ন এলকায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে এর কামড় ঘটে। এই সাপ অনেক সময় পায়ে জড়িয়ে ধরে কামড় বসায় সেক্ষেত্রে শরীরে পা-এর চাপ পড়লে তবেই এমনটা ঘটে। দাঁড়াস সাপের কামড় ঘটে ঘরের ভেতর, কাঠের জ্বালানি, উঠান ও বাগানে এবং তা দিনের বেলায় কারণ সাপটি দিবাচর। গাছের সাপ লাউডগা, বেতআঁচড়া দিনের বেলা চলাচল করে ও কামড় ঘটায়।

সাপ কামড়ের সময়কাল থেকে বোঝা যাচ্ছে, কিছু ভোরে ও সন্ধ্যায় আর কিছু সাপ দিনে ও রাতে উভয় সময়েই কামড়ায়। ব্যতিক্রম কালাজ সাপ, যে গভীর রাতে বিছানায় মানুষকে কামড়ায়। কেউটে সন্ধ্যায় ও সকালে প্রধানত জলাজায়গায় বা কাছাকাছি এলাকায় কামড়ায়। চন্দ্রবোড়া সাপ দিনে ও সন্ধ্যায় যে কোন স্থানে কামড়াতে পারে তবে স্যাতস্যাতে ও ছায়াযুক্ত ছোট ঝোপের ভেতর কামড় ঘটে। বিষহীন জলঢোঁড়া পুকুর ও ঘাট সংলগ্ন এলাকায় কামড় বসায়। আর ঘরচিতি সন্ধ্যায় ঘরে-বারান্দায় কামড়ায়। দাঁড়াস দিনের বেলা কামড়ায়, চেহারা বেশ বড়সড় হওয়ায় কামড়ালে প্রায়শই দেখা বোঝা যায়। কাজেই কোন সময়ে ও কোন স্থানে সাপ কামড়াচ্ছে তা জানা বোঝা যায়। যেমন জলঢোঁড়া বা মেটেলি সাপ উঠানে এসে কামড়াবে না। তেমনি কালাজ বা ঘরচিতি সাপ পুকুরপাড়ে পারতপক্ষে কামড়ায় না। একইভাবে চন্দ্রবোড়া উঠানে-বারান্দায়-ঘরে কামড়াবে

না কিন্তু কেউটে ঘরের ভেতর ইঁদুরের গর্তে কামড়াতে পারে আবার দাঁড়াস সাপও ইঁদুরের গর্ত থেকে কামড়াতে পারে, সেক্ষেত্রে কামড়ের চিহ্ন দেখেও অনেককিছু বোঝা যায়। যা পরে আলোচিত হবে।

সাপের কামড়ের চিহ্ন

এই অধ্যায়ে সাপ নামক প্রাণীটি কামড় দেওয়ার পর মানুষের শরীরে কী কী ঘটে চলে তা আলোচিত হবে। সাপ কামড়ের পর মন-শরীর-পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই তিনের ওপর নির্ভর করেই পরবর্তীতে শুরু হয় অচিকিৎসা-চিকিৎসা, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি বাড়া-কমা, এমনকী বাঁচা-মরাও। অথচ সাপের কামড় বিষয়টি সভয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বইপত্র থেকে সেমিনারসহ বিশেষজ্ঞদের মতামতে। বরঞ্চ বিষয়টি 'বিভ্রান্তিমূলক', 'বিতর্কিত', 'দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞমহলের স্বীকৃতি নেই'—তাই, অপ্রয়োজনীয় গুরুত্বহীন।

স্মর্তব্য, 'যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা', ক্যানিং-এর সমীক্ষার বিষয় ছিল—সাপ, সাপের কামড় ও চিকিৎসা বিষয়ক। সাপ কামড়ের পর শারীরিক পরিবর্তনগুলো সমীক্ষাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যদিও বেশ কয়েকমাস থেকে বছর—এতদিন পর দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় তবুও চেষ্টা চালানো হয়েছে বিভিন্ন প্রশ্নাবলী ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে, সাপের কামড় ঘটলে তা আক্রান্ত ব্যক্তির স্মৃতিতে থেকে যায় যা ভুক্তভোগীরাই অনুভব করবেন মাত্র, এমনই ভীতিপ্রদ প্রাণী সাপ। এই প্রাণীটি যখন কামড় বসায় তখন চামড়া ভেদ করে দাঁত ঢুকে যায়। স্বভাবতই এক বা একাধিক দাগ চামড়ায় ফুটে উঠবে এবং তা খালি চোখে দেখাও যাবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে ১৯৯৩ সাল থেকে সংস্থা কাজ শুরু করে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীদের পাশে থাকার সুবাদে কামড়ের দাগ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে এবং এই পর্যবেক্ষণের সময়কাল ক্রমে বেড়েছে। রোগীর পরিজন, নার্স, চিকিৎসকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাত-বিরেতে পৌঁছে যাওয়া রোগী-চিকিৎসকদের মাঝে যোগসূত্র তৈরি হওয়ার ফলস্বরূপ রোগীরা আশ্বস্ত হয়েছেন আর চিকিৎসক ও নার্সরা নির্ভরতা পাওয়ায় রোগীর পাশে থেকেছেন। বিষধর বা বিষহীন যে কোন সাপের কামড়ের ক্ষেত্রেই সত্যি। পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক আস্থা এনে দিয়েছিল চিকিৎসকদের। ফলে রেফারড্ রোগীর সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে এসেছে। এই প্রেক্ষিতে প্রথম ২০০২ সালে কালাজ সাপের (Common Krait) কামড়ের পরবর্তী লক্ষণসমূহ

লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়। কেউটে সাপের (Monocled Cobra) কামড়ের লক্ষণসমূহ নথিভুক্ত হয়, সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বিষহীন সাপের কামড়ের দাগ ও পরিবর্তনসমূহ যুক্ত হয়। উল্লেখ্য, কালাজ ও কেউটে এই দুটো বিষধর সাপের

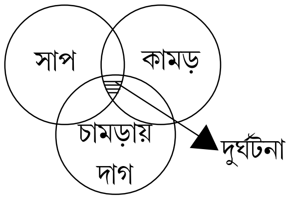

কামড়ের রোগীরাই হাসপাতালে আসত কারণ ক্যানিং মহকুমার চারটে ব্লকে কেবলমাত্র উক্ত বিষধর সাপেরই দেখা মেলে। কেবলমাত্র দুটো বিষধর সাপ থাকায় নিবিড় পর্যবেক্ষণে যেমনি সুবিধা হয়েছে তেমনি সাপের কামড়ের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়া গেছে। এছাড়াও, ‘সাপের কামড়ে হেল্পলাইন’ পরিচালনার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কামড়ের দাগ, লক্ষণ সম্পর্কে একই ফলাফল মিলেছে। সর্বোপরি, ‘সাপের কামড়ে আর মৃত্যু-মুখ নয়’—এই শিরোনামে এই তিনটে বৃত্তের কোন একটা বাদ দিলে তাকে আর দুর্ঘটনা বলা যাবে না। কাজেই সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে চামড়ায় ক্ষত বা দাগ (Fang Mark) থাকাটা আবশ্যক। তা সে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক, তার দাগকে অস্বীকার করা যাবে না। বিষহীন ও বিষধর সাপের কামড়ের দাগ ও লক্ষণ নিচে দেওয়া হল—

বিষহীন সাপের কামড়

সাপ যদি কামড়ায় দাগ রেখে যায় চামড়ায়। নিচের সারণি দ্রষ্টব্য।

কামড়ের দাগ ও রক্তপাত

	কামড়ের দাগ তিন থেকে পাঁচ	পাঁচ থেকে সাত	দুটি বা অস্পষ্ট	অল্প রক্ত-পাত	বেশি রক্ত-পাত	যন্ত্রণা	ফোলা
দাঁড়াস	×	√	×	×	√	√	×
ঘরচিতি	√	×	√	√	×	√	×
বেতআঁচড়া	√	×	×	√	×	√	×
জলঢোঁড়া	×	√	√	×	√	√	×
মেটেলি	√	×	×	√	×	√	×

বিষহীন সাপের কামড়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে চামড়ায় দাগ থাকে তিন থেকে পাঁচটা, ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে দাগ থাকে পাঁচ থেকে সাতটা,

১০ শতাংশ ক্ষেত্রে দুটো দাগ বা অস্পষ্টতা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই দাগ হয় লম্বা বা চেরা, অনেকটা উল্টানো 'V'-আকৃতির। সাপের সামনের চোয়ালের আকৃতিও একইরকম এবং দাঁতের সারি সমান হওয়ায় কামড় বসালে চাপের ওপর নির্ভর করে সামঞ্জস্যপূর্ণ দাগ ফুটে ওঠে।

রক্তপাত—গভীর কামড় হলে রক্তপাত অনেকটাই হবে। অগভীর কামড়ের ক্ষেত্রে বিন্দু বিন্দু রক্ত বার হবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে জমাট বাঁধবে ও কালচে রং ধারণ করবে।

যন্ত্রণা—বিষহীন সাপের ক্ষেত্রে কম বেশি যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

ফোলা—৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে ফোলা থাকে না। ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে অ্যালার্জি জনিত কারণে সামান্য ফোলা দেখা যায়।

আবার ফিরে আসা যাক সাপদের কথায়। দাঁড়াস—বেশ বড়সড় শরীর হওয়ায় কামড়ে জোর থাকে তাই অনেক দাঁতের দাগ থাকে। কামড়ের পর টানাটানি করলে চামড়া ছিঁড়েও যায়। কামড়ে স্বভাবতই প্রচুর রক্তপাত ঘটে।

ঘরচিতি সাপ বেশ ছোটখাট, মুখ বেশ ছোট, ফলে কামড় ভালোভাবে দিতে না পারার জন্য আঁচড়ের সংখ্যা বেশি হয় না, রক্ত কম বের হয় ও বিন্দু বিন্দু আকারে তা দেখা যায়।

বেতআঁচড়া সাপ সরু, লম্বা, মুখও লম্বাটে ও ছোট ফলতঃ কামড় গভীর না হওয়ায় দাঁতের সংখ্যা কম হয়।

জলঢোঁড়া এমন এক সাপ যার চোয়ালের ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই দাঁড়াস সাপের মতনই কামড়ের পর অনেক সময়েই ক্ষত গভীর হয় ও দাঁতের সংখ্যাও বেশি হয়, প্রচুর রক্তপাত ঘটে। রাতের অন্ধকারে পুকুরপাড়ে কামড়ালে আর সঙ্গে রক্তপাত হতে থাকলে চিৎকারে আশপাশের দু-চার গ্রামের মানুষ এক জায়গায় হয়ে যায়। অথচ এই সম্পর্কিত সামান্য জ্ঞান থাকলে ভয়, অর্থদণ্ড সবই কমে। এই সাপের আরো একটা বৈশিষ্ট্য পায়ে জড়িয়ে কামড়। এক্ষেত্রে গায়ে পা পড়লে এমনটা ঘটে।

সবশেষে মেটেলি সাপ। ছোটখাট চেহারা। নিরীহ, গায়ে চাপ না পড়লে কামড়ায় না। তিন-চারটে দাগ দেখা যায় আর রক্ত খুব কম বার হয়।

এছাড়া সাপের কামড়ের জগতেও মিমিক্রি রয়েছে যা এতদিন অজানা ছিল। বিষহীন সাপগুলোর মধ্যে জলঢোঁড়া ও ঘরচিতি কামড়ালে অনেক সময়েই দুটো দাঁতের দাগ দেখা যায়। কারণ চোয়ালের শেষ প্রান্তে অপেক্ষাকৃত বড় দুটো দাঁত দু'প্রান্তে থাকে যা দিয়ে শিকারকে গ্রিপ করতে সুবিধা হয়। তাই বড় হাঁ করে

কামড়ালে দুটো দাগ হতে পারে আর ভয় পেয়ে কামড়ালে অথবা চোয়ালের সামনের প্রান্ত দিয়ে কামড় বসালে অনেক দাগ হয়। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় দুটো দাগ থেকেই লাল রক্ত বার হবে এবং জমাট বাঁধবে। দেখা গেছে, এই ধরনের কামড়ে জোর না থাকায় অনেক সময়েই দাগ অস্পষ্ট হয়। এক্ষেত্রে দাগ দুটোর মধ্যে দূরত্ব হয় অনেকটাই, দু-সেন্টিমিটারের বেশি যা বিষধরের কামড় থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে।

বিষধর সাপের কামড়

বিষধর সাপ কামড়ের ক্ষেত্রে বিশেষ চিহ্ন ও লক্ষণ রেখে যায়। বিষযুক্ত সাপের মুখের সামনে দুটো বড় দাঁত থাকে তাই কামড় বসালে নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটো দাঁত বসবে বা দাগ হবে (Fang Mark)। তাড়াতাড়ি কামড়ানোর জন্য কখনো-সখনো একটা দাঁতের দাগও দেখা যায়। ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে চারটে দাঁতের দাগও থাকে। সেক্ষেত্রে দাগগুলো একই সরলরেখায় থাকবে। এমনটা হওয়ার কারণ সাপের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দাঁত খসে পড়ে, পাশ থেকে নতুন দাঁত ওঠার পরেও অনেক সময় এক-দুদিনের জন্য পুরাতন দাঁত থেকে যায়। এই সময় কামড়ালে ঠিক মতো গ্রিপ করতে না পারার জন্য ঠিকমতো বিষ (Venom) ঢালতে পারে না। একে শুষ্ক দংশন বা Dry Bite বলে। বিষধরের কামড়ের দাগগুলি হবে খুবই তীক্ষ্ণ, চামড়া ভেদ করে অনেকটা গভীরে গেছে ভালো করে দেখলে বোঝা সম্ভব। চামড়ার ঠিক নিচে কালচে বর্ণ দেখা যাবে যা বিষহীন সাপের কামড়ের থেকে ভিন্নতা প্রকাশ করে।

রক্ত চুঁইয়ে পড়া—ক্ষতস্থান থেকে হলদে রক্তরস চুঁইয়ে (Oozing) বার হয়, সঙ্গে চোঁয়ানো রক্ত থাকতে পারে।

যন্ত্রণা—বিষধর সাপের কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে মিনিট খানেকের জন্য আক্রান্ত ব্যক্তি অবশ থাকেন, ঠিক তার পরে পরেই কামড়ের জায়গায় যন্ত্রণা শুরু হবে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা নিচ থেকে ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়বে। ব্যতিক্রম কালাজ সাপ যা পরে আলোচিত হয়েছে। কেউটে ও গোখরোর ক্ষেত্রে এই যন্ত্রণা অনেকটাই সহ্যের মধ্যে থাকে কিন্তু চন্দ্রবোড়ার কামড়ের যন্ত্রণা সহ্যের থেকে অসহ্যের দিকে এগিয়ে চলে ক্রমান্বয়ে।

ফোলা—কামড়ের মিনিট খানেকের মধ্যেই আক্রান্ত জায়গাটা ফুলতে শুরু করে যা খালিচোখে দেখেই বোঝা যায়। উল্লেখ্য, চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে এই ফোলা দ্বিগুণ আকার ধারণ করবে অন্য অংশ থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে। এই ফোলা যদি না দেখা যায় তবে মারণ বিষ (Lethal Dose) ঢালতে পারে নি সাপ।

ফোসকা—ক্ষতস্থানে, ঘণ্টাখানেক পর ফোসকা দেখা যেতে পারে বিশেষতঃ কেউটে সাপের কামড়ে।

যন্ত্রণাহীন কামড় যার, কালাজ নাম তাঁর

পূর্বের লেখা থেকে বোঝা গেল বিষধর সাপের কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে দুটো দাঁতের দাগের সঙ্গে জ্বালা-যন্ত্রণা সঙ্গী হয়ে ওঠে এবং তা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। একমাত্র বিষধর কালাজ সাপ যার কামড়ে কোন জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না বরঞ্চ আক্রান্ত ব্যক্তি আরো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হন এবং তা চলে এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত। সমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা যায় আশি শতাংশ (৮০%) ক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় কামড় খেয়েছেন আর কুড়ি শতাংশ (২০%) কামড় খেয়েছেন আধো ঘুম বা জাগ্রত অবস্থায়। বিছানায়। এই কুড়ি শতাংশ মানুষের কামড়ের সঙ্গে সঙ্গেই জেগে যাওয়া বা সচেতন থাকায় তাদের বক্তব্য—কামড়ের জায়গাটা মিস্‌মিস্ করছিল। কামড়ের এক থেকে দেড় ঘন্টা পর শুরু হয় পেট ব্যথা সহ আনুষঙ্গিক লক্ষণসমূহ। বাকি আশি শতাংশ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় কামড় খাওয়াজনিত কারণে বুঝতে বা বলতে পারেন না নিঃশব্দ ঘাতক (Silent Killer) কালাজ কামড়ে পালিয়েছে যা তার স্বভাবজাত। ফলতঃ পেটে ব্যথা নিয়ে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন আন্ত্রিক বা অন্য কোন রোগ মনে হয় রোগীর। তার পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষসহ চিকিৎসকদেরও বাড়ে বিভ্রান্তি, বাড়ে মৃত্যু মিছিল।

দু-হাজার সাল নাগাদ যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং-এর নিরলস প্রচেষ্টায় ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের পর্যবেক্ষণ করে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। উক্ত হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে আলোচনা করে কালাজ সাপ কামড়ের পরবর্তী ধাপগুলো জানানো ও সঠিক ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। পরবর্তীতে কয়েকজন চিকিৎসক ঐ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আস্থা রেখে অন্যান্য বিষধর সাপের কামড়ের অনুরূপ চিকিৎসা, অর্থাৎ AVS (অ্যান্টি ভেনম সিরাম) দিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন এবং ফলাফলে সমৃদ্ধ হয়ে অন্যান্য চিকিৎসকরাও হাত মেলান। ফলে মৃত্যু-হার কমতে থাকে। আস্তে আস্তে বিষয়টি অর্থাৎ ‘‘কালাজের কামড়ে পেট ব্যথা’’—বাইরের জগতেও গুরুত্ব পেতে থাকে বিভিন্ন লেখালেখির সুবাদে। এই প্রেক্ষিতে, সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণে একই ফলাফল মিলেছে যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

কালাজ, কেউটে, চন্দ্রবোড়া-র কামড়ের লক্ষণসমূহ (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রমানুসারে লক্ষণ প্রকাশ পায়)

কালাজ	কেউটে	চন্দ্রবোড়া
১) কামড়ের এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর শুরু হয় পেট ব্যাথা। ২) হাত ও পা-এর গ্রন্থিতে ব্যাথা। ৩) সারা শরীরে ব্যাথা। ৪) বমি বা বমি ভাব। ৫) পায়খানা বা পায়খানার বেগ। ৬) গলায় ব্যাথা। ৭) মুখ থেকে লালা নিঃসরণ। ৮) নাকি স্বরে কথা। ৯) চোখের পাতা পড়ে আসা। ১০) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।	১) এক মিনিটের মধ্যে কামড়ের জায়গায় জ্বালা-যন্ত্রণা, চুঁইয়ে রক্তরস বার হয়। ২) যন্ত্রণা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে ছড়াতে থাকে। ৩) আক্রান্ত স্থান আধ ঘণ্টা পর থেকে ফুলতে থাকে। ৪) বমির উদ্রেক বা বমি করা (অত্যধিক ভয়ে, উৎকণ্ঠা থেকেও বিষহীনের কামড়ের রোগী বমি করতে পারে)। ৫) গলায় ব্যাথা বা ঢোঁক গিলতে কষ্ট। ৬) মুখ থেকে লালা নিঃসরণ যা কেউটে, গোখরোর কামড়ে বেশি ঘটে। ফলতঃ গলার ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচলের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে আচমকাই রোগী মারা যেতে পারে গলায় কফ আটকে। ৭) চোখের পাতা পড়ে আসে ও শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ৮) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।	১) কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয় এবং ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ে। ২) জায়গাটা দ্রুত ফুলতে থাকে। এক ঘণ্টার মধ্যে জায়গাটা ফুলে প্রায় দ্বিগুণ আকার ধারণ করে। যদি না ফোলে তবে ধরে নিতে হবে মারণ কামড় দিতে পারে নি। ৩) লঙ্কা বাটার মতো জ্বালা ও যন্ত্রণা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ৪) মুখের মাড়ি বা যে কোন কাটা জায়গা থেকে ছিট রক্ত বা রক্ত দেখা যাবে। ৫) মূত্রের সঙ্গে রক্ত বার হবে, বমি বা পায়খানার সাথে রক্ত বার হতে পারে (কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত)। ৬) চোখ লাল বর্ণ আকার ধারণ করা। ৭) অবশেষে সারা শরীর ফুলতে থাকে। ৮) মূত্র বন্ধ হতে থাকবে। ৯) চন্দ্রবোড়ার কামড়ে টোসিস সহ জিভ ও গলায় অসাড়তা দেখা যায়।

<u>বিছানায় কালাজ ছাড়াও আরো তিনটে প্রাণীর কামড় ঘটে যা জানা খুব জরুরি</u>

শতকরা হার	কামড়ের লক্ষণ
কালাজ— ৫	প্রাথমিকভাবে বুঝতে পারা যায় না।
ঘরচিতি— ১	প্রাথমিকভাবে বুঝতে পারা যায় কারণ কামড় গভীর হয়। কামড় ও জ্বালা জনিত কারণে ঘুম ভেঙ্গে যায়।
বিছা— ৯০	বিষের তীব্রতার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গে। জায়গাটা অল্প ফোলে, দুটো দাগ হয়। সঙ্গে থাকে তীব্র জ্বালা যা সঙ্গেসঙ্গেই শুরু হয়।
ইঁদুর— ৪	কামড়ে দাঁতের চাপ থাকায় ঘুম ভেঙ্গে যায়। দুটো দাগ হয়। সঙ্গে চামড়া ছিঁড়ে যায় (যা নিরীক্ষণ করলে তবে বোঝা যাবে)। সঙ্গে রক্তপাত।

(সংক্ষেপিত)

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, জানুয়ারি ২০১৬)

ক্ষেতমেটে সাপ, বিষহীন

মেটেলি সাপ, বিষহীন

গোসাপ, বিষহীন

তক্ষক, বিষহীন

পশ্চিমবাংলার একটি সাপের বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র আবশ্যক কেন?

দয়াল বন্ধু মজুমদার

সাপের কামড়ের চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের রাজ্য, দেশের মধ্যে আজ একটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। গত ২০০৭ সাল থেকে লাগাতার লেখালেখি, চিঠিচাপাটি চালাচালি করতে করতে, ২০১১ সালের শেষ দিকে আমাদের স্বাস্থ্য ভবনের কিছু কর্তাব্যক্তিদের রাজি করানো সম্ভব হয়। এই প্রথম সরকারিভাবে সাপের কামড়ের সমস্যাটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ২০১২ সাল থেকে, বিশেষ করে গ্রামীণ হাসপাতালের ডাক্তার আর বেশ কিছু নার্সিং স্টাফকে সাপের কামড়ের চিকিৎসা নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া চলেছে। কয়েক হাজার ডাক্তারকে এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ইঞ্জেকশন, এ.এস.ভি. বা এ.ভি.এস.

বিষক্রিয়ার ফলে চোখ বুজে আসে (Ptosis)

গত বছর ছয়েক এ রাজ্যের সব কটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপের কামড়ের চিকিৎসা একেবারে নিশ্চিত করা গিয়েছে। বেশকিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক এক জন ডাক্তারবাবু, এই সাপের কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী কাজ করে দেখিয়েছেন। আমরা ঠিক যে সময় এ রাজ্যে, সাপের কামড়ে চিকিৎসার ব্যাপারটি প্রায় সমাধান হয়ে গিয়েছে ভাবতে শুরু করেছি, তখন এক নতুন সমস্যা দেখা দিল।

২০১৭ সালের প্রথম থেকেই আমাদের কাছে খবর আসতে থাকে যে **চন্দ্রবোড়া সাপের** (Russell's Viper) কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতীয় চিকিৎসাবিধি মতে, সিংহভাগ ক্ষেত্রে দশটি এ.এস.ভি. বা এ.ভি.এস. দিয়ে চিকিৎসা করলেই রুগী সুস্থ হওয়ার কথা। সামান্য কিছু সংখ্যক রুগীর ক্ষেত্রে কুড়িটি অ্যান্টিভেনম লাগতে পারে। আর বিরল

কিছু কিছু চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য তিরিশটি অ্যান্টিভেনম লাগতে পারে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্রায় সব চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের রুগীকে কুড়িটি অ্যান্টিভেনম দিতে হচ্ছে। এমনকি প্রায়শই তিরিশটা অ্যান্টিভেনম দেওয়ার পরও, রুগীর কিডনি বিকল হয়ে যাচ্ছে।

সাধারণভাবে আমাদের জানা আছে যে, যে-কোন সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্যই, তাড়াতাড়ি অ্যান্টিভেনম দেওয়াই, সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টিভেনম দিতে যতো দেরি হয়, রুগীর কিডনি ততোটাই বিকল হতে থাকে। এ দেশে, আজ চিকিৎসা ব্যবস্থার এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, মানুষ ওঝার বাড়িতে সময় নষ্ট করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসছেন। এ ব্যাপারে বহু অসরকারি সংগঠন লাগাতার প্রচার করেও, আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না।

যে সকল রুগী সাপের কামড়ের পর দু'ঘণ্টা পার করে হাসপাতালে পৌঁছচ্ছেন, তাদের কিডনি যে বিকল হবেই, এটা এখন সকল ডাক্তারবাবুই জেনে গেছেন। কিন্তু আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে, বেশ কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করছেন যে, এমনকি এক ঘণ্টার মধ্যে অ্যান্টিভেনম দেওয়ার পরও, বেশকিছু চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের রুগীর কিডনি বিকল হয়ে যাচ্ছে। এতে করে আন্টিভেনমের কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়।

যে কোন ওযুধপত্রের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ থাকলে, যে যে বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে, কারণ অনুসন্ধান করা হয়, আমরা সেগুলি নিয়ে বিচার বিবেচনা করে দেখতে থাকি।

এখানেই সাপের বিষের **অ্যান্টিভেনমের** সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি জিনিস সংক্ষেপে বলে নেওয়া উচিত। আমাদের দেশে এখন যে পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনম বা সংক্ষেপে এ.এস.ভি. পাওয়া যায়, সেগুলি হল **ঘোড়ার সিরাম**। অ্যান্টিভেনমের উৎপাদক ল্যাবরেটরিগুলিতে, ঘোড়াকে অতি সামান্য মাত্রায় সাপের বিষ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ঘোড়ার শরীরে ঐ বিষের বিরুদ্ধতা করার জন্য, অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। প্রতিটি রোগের জীবাণু যেমন আলাদা আলাদা,তাদের বিরুদ্ধে তৈরি অ্যান্টিবডিও তেমনি সুনির্দিষ্ট। হামের টিকা নিলে যেমন টিটেনাস প্রতিরোধ হয়না, তেমনি টিটেনাস প্রতিরোধ করার টিকা জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না।

সাপের বিষের ক্ষেত্রেও ঘোড়াকে যে সাপের বিষ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট সাপের বিষের বিরুদ্ধতা করার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এখন

আমাদের দেশে যে পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনম তৈরি হয়, তার জন্য চার রকম সাপের বিষ ব্যবহার করা হয়। এই চারটি প্রজাতি হল গোখরো (Spectacled Cobra), কালাচ (Common Krait), চন্দ্রবোড়া (Russell's Viper) আর ফুরসা (Indian Saw-scaled Viper)। এই ফুরসা সাপ আমাদের রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও পাওয়া যায় না। এটি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে পাহাড়ে অরণ্যে ও উপকূলে দেখা যায়।

যদিও এই চার প্রজাতির বাইরে আরও অনেক রকম বিষধর সাপ আমাদের দেশে আছে, গত প্রায় একশ বছরের হিসেব মত দেখা যায়, এই পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনম তৈরিতে ব্যবহৃত না হলেও এই পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনম দিয়ে কেউটে সাপের কামড়ের রুগীর চিকিৎসা করতে কোন সমস্যা হয়না। এর কারণ, গোখরো সাপের বিষের সাথে কেউটে সাপের বিষের গঠনগত সামঞ্জস্য।

এই গঠনগত সামঞ্জস্য আর বৈসাদৃশ্যই আমাদের নতুন সমস্যার মূল। নামে চন্দ্রবোড়া হলেও বিশাল দেশ এই ভারতের বিভিন্ন এলাকার চন্দ্রবোড়া সাপের বিশেষ গঠনগত অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানীরা এখন এ দেশের চন্দ্রবোড়া সাপেদের তিনটি সাব টাইপ বা শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। দক্ষিণ ভারত, উত্তর পশ্চিম ভারত আর পূর্ব ভারত; মোটামুটি এই তিনটি ভৌগোলিক এলাকার চন্দ্রবোড়া সাপের বিষের চরিত্র তিন রকম।

বর্তমানে এ দেশের আট নটি অ্যান্টিভেনমের উৎপাদক ল্যাবরেটরিগুলিতে সাপের বিষের যোগান আসে একমাত্র তামিলনাড়ুর একটি সংস্থা থেকে। মাম্মাল্লাপুরম বা মহাবলীপুরমের **ইডুলা কো-অপারেটিভ সোসাইটি** একমাত্র স্বীকৃত বিষ সংগ্রাহক সংস্থা। ওরা দক্ষিণ ভারতের ওই একটি মাত্র কাঞ্চীপুরম জেলার সাপেদের বিষই সংগ্রহ করে। এই যে একমাত্র তামিলনাড়ুর সাপের বিষের থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিভেনম, এগুলি পূর্ব আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাপের কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল দেবে না, এটাই স্বাভাবিক।

এই বিপদের সম্ভাবনা অন্তত পাঁচ বছর আগে লিখেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু অদ্ভুতভাবে, এই সব বিজ্ঞানীর সাবধান বাণীকে ভুল প্রমাণ করছিল, ভারতীয় পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনম। ২০১৬ সালের শেষ পর্যন্ত অ্যান্টিভেনামের কার্যকারিতা নিয়ে কোন সমস্যা আমরা শুনিনি। হঠাৎ করেই কেন এ সমস্যা দেখা দিল? স্বাভাবিকভাবেই অ্যান্টিভেনমের গুণগত মান নিয়েই প্রশ্ন উঠতে থাকে। আর, শুনতে যতোই অপ্রিয় আর কর্কশই শোনাক, সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা ওষুধের গুণগত মান নিয়ে, আম জনতার মত আমরাও সন্দিহান হই। এছাড়া কোল্ড

চেন ঠিকমত না থাকাও আমাদের বিবেচনায় থাকে। কিন্তু একই পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনম, গোখরো কালাচ আর কেউটের কামড়ে ঠিকঠাক কাজ করায়, ওই দুটি প্রধান কারণকে সহজেই নস্যাৎ করা গেল।

তাহলে কারণটা কি? বিশেষ করে কেউটে সাপের কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানসম্মত অ্যান্টিভেনমের ব্যবহার না হলেও কোন সমস্যাও কোনদিন হয়নি। এসব দিক বিবেচনা করে আমাদের মনে হয়েছে, যেকোন ভাবেই হোক, কেউটে সহ পশ্চিমবঙ্গের সাপের বিষের একটা যোগান, ল্যাবরেটরিগুলিতে যাচ্ছে।

২০১৭ সালের পুজোর আগে, আমরা বন্যপ্রাণ দপ্তরে বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করি। এই পশ্চিমবঙ্গের সাপের বিষের সরবরাহ, সরকারিভাবে কি করে করা যায়, এসব নিয়েই ওনার পরামর্শ চাই। ওনার কাছেই জানতে পারি যে, কলকাতার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কাছে এই বিষ সংগ্রহের সরকারি অনুমতি আছে। ওনারা চাইলেই, আমাদের অভিমত, পশ্চিমবঙ্গের সাপের বিষের যোগান ল্যাবরেটরিগুলিতে যেতেই পারে। আমরা কয়েকদিনের মধ্যে ওই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করি। জানতে পারি যে, নানান জটিলতায় ওনাদের নিজস্ব অ্যান্টিভেনমের উৎপাদক ল্যাবরেটরি বন্ধ হয়েছে ২০০১ সালে। উনি একটু আশার কথাও শোনান যে, আবার ওই ল্যাবরেটরি চালু করার একটা প্রস্তাব ওনাদের বিবেচনায় আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ওনারা সেই দক্ষিণ ভারতের ইডুলা কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকেই বিষ আনার কথা ভাবছেন।

কিন্তু ওই ইডুলার বিষ আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় দশগুণ বেশি দাম। তবুও ওঁদের এ রাজ্যের বিষ ব্যবহার করার অসুবিধা কি? এই প্রশ্নের উত্তরটাও আমরা জেনেছি, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই রহস্যময় যে, জানলেও আজ আর সেটি প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

জীবনদায়ী এমন একটি বিষয় কেন এমন রহস্যময় হয়ে থাকল। আসলে ওই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা সরকারিভাবে প্রাপ্ত অনুমতিকেই, কিছু বেআইনি ভাবে কাজে লাগিয়েছেন এবং সেটা ওই ২০১৬ সাল পর্যন্ত। ওই সংস্থায় এ রাজ্যের বিষ সরবরাহকারী কিছু ব্যক্তির বেআইনি কাজ ওই সময় ধরা পড়ে। ফলে আমাদের হিসেবও মিলে যায়। ওই যে বলেছিলাম, কেউটে সহ এ রাজ্যের সব সাপের বিষের যোগান ল্যাবরেটরিগুলিতে কোন না কোন ভাবে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই যোগানটি বন্ধ হওয়ার ফলে, আজ আমরা যে অ্যান্টিভেনম পাচ্ছি, সেটি এ রাজ্যের চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল দিচ্ছে না।

এ রাজ্যের সাপেদের বিষ সংগ্রহের জন্য যে সরকারি অনুমতি লাগে তার চাবিকাঠিটি আমাদের ওই বড় কর্তার হাতেই। ওনাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, আর কোন অসরকারি সংস্থার এই অনুমতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ওনার পরামর্শ মত আমরা এখন কিছু সরকারি সংস্থাকেই এ কাজ করতে অনুরোধ করছি। এক দুজন প্রাথমিকভাবে রাজিও হয়েছেন। কিন্তু দুটি বা তিনটি সরকারি দপ্তরের অফিসারের সহমতের ভিত্তিতেই এই অত্যন্ত জরুরি কাজটি সফল হতে পারে। সরকারি লাল ফিতার ফাঁসই এক্ষেত্রেও সবথেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অত্যন্ত আশার কথা; সম্প্রতি এ রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের এক দুজন বড় কর্তাকে এই ব্যাপারটাতে আগ্রহী দেখা যাচ্ছে।

এই একটি কাজ বেশ কয়েকটি সুদরপ্রসারী সুফল দেবে। এ রাজ্যের সাপেদের বিষ সংগ্রহের একটি কেন্দ্র তৈরি হলে, এ রাজ্যের সাপে কাটা রুগীদের চিকিৎসায় যথাযথ অ্যান্টিভেনমের উৎপাদন নিশ্চিত হবে। তাতে করে আজ যে রুগীগুলি কিডনি বিকল হয়ে মারা যাচ্ছেন, তাঁরা প্রাণে বাঁচবেন। শুধু এই চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের রুগীদের জন্যই কত লক্ষ কোটি টাকার ডায়ালিসিস মেশিন তথা লোক বল লাগছে, এসব প্রায় লাগবেই না। সরকারি হিসেবেই দশটি অ্যান্টিভেনমের দাম ছয় থেকে আট হাজার টাকা। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিরিশের জায়গায় দশটি অ্যান্টিভেনমের ব্যবহারের ফলে, প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা কম খরচ হবে। সরকারিভাবে বিষ সংগ্রহের ফলে, ল্যাবরেটরিগুলিকে অনেক কম দামে বিষ সরবরাহ করা যাবে। তাতে অ্যান্টিভেনমের উৎপাদন খরচও কমবে। তামিলনাড়ুর ইডুলাদের মত, এ রাজ্যেও কয়েক হাজার সাপুড়ে বা বেদে আছেন; তাদেরও একটা কর্মসংস্থান হবে।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০১৮)

ময়াল বা অজগর সাপ (Python), বিষহীন, পেঁচিয়ে ধরে

ট্যারেন্টুলা : রজ্জুতে সর্পভ্রম

শুভেন্দু বাগ

ট্যারেন্টুলার আক্ষরিক অর্থ নাকি ''ঘোড়ার নাচ''। তা বটে। গত কয়েক বছরে ট্যারেন্টুলা নামটি বাঙালিকে যা নাচিয়েছে তাতে নামকরণ কিয়দংশে সার্থক বটে। প্রতি বছর মার্চ থেকে জুলাই বাঙালির মননে একটি আলাদা স্থান করে নেয় এই বৃহদাকৃতি কালো বা বাদামি রঙের লোমশ প্রাণীটি। মিডিয়ার কল্যাণে ট্যারেন্টুলা নয় এমন নিরীহ মাকড়সাও এই কয়েকমাস ট্যারেন্টুলা সম্ভ্রম আদায় করে অবশেষে ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে পরলোকগমন করে।

বাঙালির সঙ্গে ট্যারেন্টুলার পরিচয় আফ্রিকান বা আমাজনিয়ান সাহিত্যের হাত ধরে। ''অ-য় অজগর আসছে তেড়ে''র পরিচয়ের উৎসও অভিন্ন। ফলে ভয় না পাওয়াটাই সাক্ষরতার অবমাননা বলে বাঙালি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। ফলে এই কয়েকমাস নিয়ম করে ভয় পায় বঙ্গবাসী। ট্যারেন্টুলার মৃতদেহ প্যাকেটে ভরে হাসপাতালমুখী হয় হতভাগ্য মানুষজন। সরকারি হাসপাতালের ভয়ঙ্কর ভিড়ের মাঝে এ যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া। একদিকে প্রাণের ভয়ে ভীত রোগী ও পরিজনদের ডাক্তারবাবুর কাছে হাজারো জিজ্ঞাস্য আর অন্যদিকে এ ব্যাপারে সঠিক প্রোটোকল না থাকায় ডাক্তারবাবুর বিড়ম্বনা-দুয়ে মিলে সাপের ছুঁচোগেলা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের সবাইকে।

আসলে ট্যারেন্টুলা বিকটদর্শন হলেও এর কামড় মোটেও প্রাণঘাতী নয়। পৃথিবীর বুকে প্রায় ৯৬৯ প্রজাতির ট্যারেন্টুলা বিদ্যমান যার মধ্যে নয়টি বিষাক্ত প্রজাতি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর জঙ্গলেই এদের দেখা বেশি মেলে। পশ্চিমবাংলার মাত্র দুটি বিষাক্ত প্রজাতির ট্যারেন্টুলা দেখতে পাওয়া যায়। তারমধ্যে আবার সেলেনোকসমিয়া প্রজাতির ট্যারেন্টুলার বিচরণ শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গে। একমাত্র কাইলোব্র্যাকিস প্রজাতির বিষাক্ত ট্যারেন্টুলা দক্ষিণবঙ্গে পাওয়া যায়। মার্চ থেকে জুলাই এদের প্রজননের সময়। সাধারণত এরা মনুষ্যদুর্গম অন্ধকার আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকলেও এইসময় পুরুষ ট্যারেন্টুলাগুলি গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্ত্রী সঙ্গিনীদের খোঁজে বেরিয়ে মনুষ্যগোচর হয়। তখনই এরা আক্রান্ত হবার ভয়ে আগেভাগে আক্রমণ করে। ঘোড়ার মত সামনের পা দুটি তুলে মুখে সাধারণত হিসস্ হিসস্ আওয়াজ তুলে হিংস্র শ্বাপদের মত আক্রমণ করে এরা। প্রথমে বিষাক্ত লোমগুলি শিকারের দিকে ছুঁড়ে দেয় যা সাধারণত মানুষের শরীরে

অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়। তারপর দংশন করে সোমাটোটক্সিক বিষ শরীরে ঢুকিয়ে দেয় এরা। এই বিষ শরীরে প্রবেশ করা মাত্র তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকে। সময়মত চিকিৎসায় এই বিষ মোটেও প্রাণসংশয়ী নয়। কিন্তু মানুষের অবহেলার সুযোগে এই বিষ ধীরে ধীরে সেলুলাইটিস তৈরি করতে পারে। যা কিনা আবার চূড়ান্ত অবহেলায় সুযোগসন্ধানী ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণে প্রাণঘাতী সেপ্টিসেমিয়ার জন্ম দিতে পারে। কামড়ের পরেই জায়গাটিতে বরফ চেপে ধরলে সংকুচিত রক্তপরিবাহকের তত্ত্ব অনুযায়ী বিষের ছড়িয়ে পড়া রোধ করা যায়। তারপর ডাক্তারবাবুদের অভিজ্ঞ চোখের শরণাপন্ন হওয়াই মঙ্গলজনক।

ট্যারেন্টুলা

গ্রামীণ পরিবেশে চিকিৎসার বদান্যতায় এযাবৎ প্রচুর ট্যারেন্টুলা কামড়ের রোগী দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখেছি সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা প্রতিটি রোগীকে সুস্থ করেছে। প্রাথমিকভাবে টিটেনাস টক্সয়েড, অ্যান্টিহিস্টামিনিক, প্যারাসিটামল গোত্রের অ্যানালজেসিক ও সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করাই শ্রেয়। সেলুলাইটিস হলে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট-গ্লিসারিনের সংমিশ্রণের ছোপ ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে। যেহেতু ট্যারেন্টুলা কামড়ের ইতিহাসে এখনও অবধি কোনো মৃত্যুর ঘটনা ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি তাই ভয়হীন আত্মবিশ্বাসী চিকিৎসা আপামর বাঙালিকে ভয়হীন করে তুলবে বলে আশা রাখি।

নিজের চিকিৎসক জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। সময়টা ২০১৬ সালের বর্ষাকাল। সন্ধ্যা আটটায় যখন রূপা নামের মেয়েটি ট্যারেন্টুলার কামড় খেয়ে ডেবরা গ্রামীণ হাসপাতালে উপস্থিত। বেরিয়ে যাবার আগে মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। কাঠের জ্বালানিতে রান্না করার সময় ষোড়শীর পায়ের নীচে পড়ে থাকতে দেখে ওরা সেটিকে মেরে এনেছে। মেয়েটির চোখ তখন ঢুলুঢুলু (শিবনেত্র), কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। সারা শরীর অবশ। ওর অসহায় মায়ের আকুতি দেখে থমকে দাঁড়ালাম। যেহেতু ওর উপসর্গের প্রায় সবগুলিই যন্ত্রণাহীন কালাচ সাপের কামড়ের সাথে মিলে যাচ্ছিল তাই রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধন্দ তৈরি হল সবার। কালাচ সাপের কামড় না নিউরোটক্সিক ট্যারেন্টুলা এই গেরোয় পড়লাম সবাই। কালাচ হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ভেবে আগেভাগেই ১০ ভায়াল এ.ভি.এস. দেওয়া হল। রোগী সারারাত আমাদের ধন্দে রেখে পরের দিন সুস্থ হল ঠিকই। কিন্তু আজও সন্দেহ রয়েই গেছে।

নিউরোটক্সিক ট্যারেন্টুলার উপস্থিতি ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলার মত দেশে। আমাদের দেশে কোনো ডকুমেন্টেড নিউরোটক্সিক ট্যারেন্টুলার কামড়ের ইতিহাস নেই। তাই এনিয়ে আমাদের মাথাব্যথাও কষ্টকল্পনা।

ট্যারেন্টুলার কামড় বাঙালির মনে গণহিস্টিরিয়ার জন্ম দিলেও এর কামড় বিষাক্ত সাপের কামড়ের তুলনায় নিতান্তই গুরুত্বহীন। বরং বোলতার কামড়ের মত নগণ্য। আমাদের অজ্ঞতাই আমাদের মনে এই অহেতুক ভয়ের জন্ম দিয়েছে। শুধুমাত্র যকৃৎ কিংবা বৃক্কের রোগে আক্রান্ত বা সুরাসেবী জনগণ যারা কিনা আগে থেকেই কম রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্মন্ন তাদের ক্ষেত্রেই এর বিষ ভয়ঙ্কর হতে পারে।

লাতিন আমেরিকার কিছু দেশে ট্যারেন্টুলাকে পোষ্য বানিয়ে রাখতে পারলে আর কম্বোডিয়ার মানুষ ট্যারেন্টুলার ফ্রাই খেতে পারলে আমরা বাঙালিরা এহেন আপাতনিরীহ প্রাণীটিকে নিছকই ভয়ের বশে খুন করে জীবহত্যার পাপ বহন করব কেন?

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০১৮)

[Injection ASV=Anti Snake Venom, Injection AVS=Anti Venom Serum। দুটি একই। দুই নামেই বলা হয়।]

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-১ (নব পর্যায়) • কুকুর, সাপ ও অন্যান্য কামড় এবং তাদের চিকিৎসা

- কুকুরের আঁচড় ও কামড় থেকে মারণঘাতী জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে
- পথ কুকুর নিয়ন্ত্রণে পৌর কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করুন; গৃহপালিত কুকুরের টিকা দিন
- কুকুর কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে 'ছাড়া কলের জলে (Running Water)' অন্তত ১৫ মিনিট কামড়ের জায়গা ভালো করে ধুয়ে ফেলুন
- যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে দেখান
- সাপ কামড়ালে রোগীকে আশ্বস্ত করুন
- সাপ কামড়ালে বাঁধন দেওয়ার প্রয়োজন নেই
- যে অঙ্গে সাপ কামড়েছে সেটি যতটা কম সম্ভব নড়াচড়া করতে হবে
- সময় নষ্ট না করে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের পক্ষ থেকে অরণি সেন কর্তৃক প্রকাশিত
যোগাযোগ: ssunnayan@gmail.com • ওয়েবসাইট: www.ssu2011.com
বিনিময় : ৬০ টাকা